লিমন

জোনাকি কিকিমিকি

খন্দকার মাজহারুল করিম

একটি রোমাঞ্চ নিবেদন

শিবলু

একটি রেমাশ নিবেদন

বাংলাপিডিএফ

বইঘর

বইলাভার্স

কাজিরহাট

Scan & Edit

Md. Shahidul Kaysar Limon

মোঃ শহীদুল কায়সার লিমন

https://www.facebook.com/limon1999

সেবা রোমান্টিক

জোনাকি ঝিকিমিকি

খন্দকার মজহারুল করিম

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 16 0164 8

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও বক্স নং ৮৫০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

JONAKI JHIKIMIKI
A Novel
By:Khandker Mazharul Karim

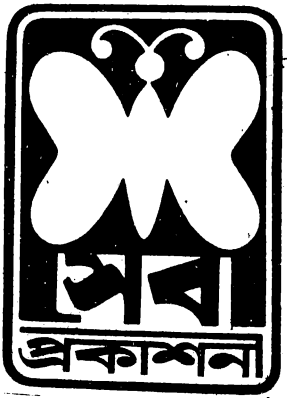

ছাব্বিশ টাকা

জনাব এস. এম. ইয়াহিয়া ও
জনাব মো. আইয়ুব হোসেন—
প্রীতিভাজনেষু।

ক'টি সেবা রোমান্টিক

খন্দকার মজহারুল করিম: সেই চোখ, তোমার জন্যে, জানিনা কখন, আমরা দুজনে, চন্দনের বনে, নও শুধু ছবি, সোনালী গরল, অনুরূপা, তুমি আছ আমি আছি, এক প্রহরের খেলা, দূর আকাশের তারা, অরণ্যের গান ১ ও ২, অতল জলের আহ্বান, একটি মাধবী, হাতে রাখো হাত, একটুখানি চাওয়া, ছায়া ঘনায়, বর্ষারাতের শেষে, ময়ূরী রাত, নীল ধ্রুবতারা, ফাগুনের ফুল, হংস পাখায় লেখা, আমার এ ভালবাসা, কেন ডাকো, সন্ধ্যার মেঘমালা, এসো আমার ঘরে, ঝড়ের রাতে, তোমাকে ভালবেসে, কঙ্কাবতী, করবী গরবিনী, কথা রাখো। **রোকসানা নাজনীন:** বন্দী অপ্সরা, ফিরিয়ে দাও ১, ২, অন্ধকারে একা ১, ২, স্বপ্নপুরুষ, এ মণিহার। **বাবুল আলম:** স্বপ্ন নিয়ে, লাল রিবন, সংশয়। **মোস্তাফিজুর রহমান:** ছলনাময়ী। **বিশু চৌধুরী:** অচেনা পরবাসী। **খসরু চৌধুরী:** তবু অচেনা। **শেখ আবদুল হাকিম:** নগ্ন প্রাচীর ১, ২, সে আমার, একা আমি, অন্তরা, হায় চিল, রজনী চঞ্চলা, বান্ধবী, সুচরিতাসু, মধুযামিনী, তমা, তুমি চিরকাল, কি শুভক্ষণে, তুমি সুন্দর, প্রিয়, যে ছিল আমার, প্রথম প্রেম, চন্দ্রাহত, হৃদয়ে তুমি, দাও বিদায়, কে তুমি এলে। **শাহরিয়ার শামস:** স্বপ্নের অপরাহ্ণ। **মিলা মাহফুজা:** তোমার দু-চোখে, সুধাবিষে। **হেলেন নওশীন:** নিঝুম।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

'...The book of life is brief
And once a page is read
All but love is dead
That is my belief...'
—From an Irish Folk Song.

এক

মার্চ মাসের একটি বৃহস্পতিবার।

যাকে বলে গোড়ায় গলদ, ঠিক তাই হলো। গলদা চিঙড়ি হলেও এক কথা ছিল। আ-কার হারিয়ে আমাদের গল্পের আকার শুরুতে পাঠককে এমন গলদঘর্ম করে তুলবে, আগে একটুও মনে হয়নি। গল্পের, বিশেষ করে রহস্যে মোড়া সিরিয়াস কাহিনীর লেখক ও'হেনরি— মানে উইলিয়াম সিডনি পোর্টার— পইপই করে বারণ করেছেন এইভাবে গল্প শুরু করতে। মার্চ মাসের একটি বৃহস্পতিবার। একটা কথা হলো নাকি? এর মধ্যে মজার আছেটা কী? সাহিত্যই বা কোথায়? মার্চ মাস বলতে প্রথমেই যা মনে হয় তা হচ্ছে ঝিরঝিরে বাতাস। বাতাসে টানটান একটা ভাব, পোড়া পোড়া

গন্ধ।

যাক, উনি নিষেধ করলে কি হবে, নিজেও বড় চমৎকার একটি গল্প শুরু করেছিলেন ওই লাইন দিয়ে। না, ঠিক ওই লাইন নয়, তাতে বৃহস্পতিবার ছিল না। তাই উনি যেভাবে দ্বিতীয় লাইনে গল্পের মোড় ঘুরিয়ে নায়িকা সারা আর তার কান্নার কাছে চলে গিয়েছিলেন, সেভাবে আমরাও যেতে পারব। পাঠক, আমাদের সঙ্গে ছোটার জন্য তৈরি আছেন তো? আমাদের গল্প কিন্তু ননস্টপ মেল ট্রেন। কোথাও থামতে হবে না, ঘামতেও হবে না।

চলুন, আগে আমাদের নায়িকা নিশির সঙ্গে দেখা করি। নিশ্চয় মানবেন, আমাদের চারপাশে এমন অনেক তরুণী আছে, যাদের রূপ বর্ণনা করার মত কিছু নেই, তবু তাদের দেখলে সংবেদনশীল পুরুষহৃদয়ে আনন্দভৈরব কিংবা জয়জয়ন্তী কানাড়া রাগিনীতে জলতরঙ্গ বেজে ওঠে। শুধু কি পুরুষ? অনেক নারীর মনের কোণেও খানিক হর্ষ আর খানিক ঈর্ষার বেশ একটা টানাপড়েন শুরু হয়ে যায় তাদের দিকে তাকিয়ে। আমাদের নিশি, যার পুরো নাম আন্নিসা শবনম, ঠিক ওইরকম এক তরুণী। আগেই বলেছি, নিশির রূপ কিংবা অঙ্গ সৌষ্ঠবের ভিতর এমন কিছু নেই, যার বর্ণনা আকর্ষক হয়ে ওঠে। ভাল কথা, মেঘদূত পড়েছেন? একটা শ্লোক বলি।

'সেখানে একহারা যুবতী শ্যামা অয়ি দর্শনপাঁতি যার সূক্ষ্ম
ওষ্ঠ তেলাকুচো ফলের মত পাকা, মধ্যে ক্ষীণ, চোখ হরিণীর
মতন সচকিত, নিম্ননাভি যার, স্তনের ভারে রূপ নম্র—
তিলোত্তমা সে যে সকল যুবতীর, বিধাতা সেইমত গড়েছেন।...'

ঠিক এইভাবে যদি আমাদের নিশির বর্ণনা দেওয়া যেত, খুশি হতাম। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, নিশির চেহারা এই বর্ণনায় ঠিক ফুটে ওঠে না। সে একহারা, কিন্তু তার মুখে আর পুষ্ট বাহুযুগলে বাড়তি লাবণ্য আছে, যা কেবল স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের মধ্যেই দেখা যায়। যক্ষের বিরহিনী প্রিয়ার মতই নিশির আছে দাঁতের ঝকঝকে পাটি, কিন্তু তা সূক্ষ্ম নয়। সে যখন হাসে মাড়ির খানিকটা দেখা যায়। তার জন্য অবশ্য তাকে খারাপ দেখায়— একথা তার শত্রুও বলবে না। বরং ওইসময় ওর মুখের দিকে তাকালে মনটা কেমন-যেন করে ওঠে। ওষ্ঠ তেলাকুচো ফলের মত টুকটুকে লাল, ঠিক আছে। কিন্তু ওর চোখ হরিণীর মত নয়, একটু ভাসা-ভাসা। মনে হয়, চোখগুলো কথা বলছে দৃপ্ত সাহসিনীর মত। নিম্ননাভি সম্পর্কে বলতে পারছি না, কারণ পোশাক আর আবরুর ব্যাপারে মেয়েটি সদা সচেতন এবং আপসহীন। ঘুমের মধ্যেও কিছু বেতাল হবার জো নেই। স্তনের ভারে সে নুয়ে পড়ে? না, মিলল না। বরং তার নিতম্বের ঐশ্বর্য একটু বাড়াবাড়ি। তার মাথায় অত্যন্ত অনুগত আর শান্তশিষ্ট চুলের বোঝা আছে, যা কখনও জায়গা ছেড়ে নড়তে-চড়তে চায় না।

এইরকম একটি মেয়ে— যার বয়স বিশেষ লুকোছাপা না করলে বিশের কূল ছাপায়নি এখনও—সিল্কের টু-পিস পরে বসে আছে কাঠের বাঙলো বাড়ির সিঁড়িতে। তার কোলের ওপর···

আচ্ছা, কোলের ওপর কী পড়ে আছে বললে পাঠক খুশি হন? ফুল নিশ্চয়! অনেক পাঠকই নিজে কল্পনার ঘোড়া ছোটাচ্ছেন আমার আগে আগে— পরমাসুন্দরী নায়িকা কাঠের বাঙলো বাড়ির সিঁড়িতে

বসে আছে। তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে, সে ভুলে গেছে মালা গাথা। তাকিয়ে আছে দূরের জঙ্গলে...

এই তো? না, ভাই। ফুল নয়, নিশির কোলে ওইদিনের খবরের কাগজ; বৃহস্পতিবারের সাহিত্য সাময়িকী। অনেক চেষ্টা করেও তাতে মন বসাতে পারেনি। কাগজের দোষ নেই। দোষ যদি দিতেই হয় দুলাভাই— মানে আমিনুল ইসলাম মানুকে দেবে নিশা। সে মোটামুটি ইনট্রোভার্ট বা অন্তর্মুখী ধরনের। হুট্ করে কোন কাজ করে বসা কিংবা হঠাৎ একদল মানুষের মধ্যে অকারণ বকবকানিতে কোন আনন্দ খুঁজে পায় না। তবে তার একটা গোপন আনন্দ আছে। দুলাভাইয়ের বিজনিস পার্টনার ইরাজ বশির এই গোপন আনন্দের উৎস। গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকায় এসে প্রথম প্রথম নানান দুর্ভোগের মুখোমুখি হতে হয়েছে নিশিকে। বশিরের সাহায্য না পেলে কী যে পরিণতি হত, ভাবলেই মন আপনা থেকে নতি জানায় লোকটার প্রতি।

আমিনুল ইসলাম মানু ব্যস্ত মানুষ। সকাল দশটা-সাড়ে দশটার আগে তার ঘুম ভাঙে না। এগারোটার ভিতর বেরিয়ে পড়ে। কদাচিৎ দুপুর আড়াইটে-তিনটের দিকে একবার খেতে আসে; বেশির ভাগ দিনেই আসে না। প্রায়ই তার দুপুরের খাওয়া হয়ে যায় হোটেল পূর্বাণী কিংবা শেরাটন-সোনারগাঁয়। মানু বলে, বিজনিস লাঞ্চ। এক ঢিলে তিন পাখি মারা আর কি। মধ্যাহ্নের আহার, ব্যবসায়িক আলাপ-আলোচনা আর প্রয়োজনীয় আপ্যায়ন। মাঝে মাঝে আপ্যায়নের সীমা অবশ্য প্রহরের পর প্রহর গড়িয়ে মাঝরাত পর্যন্ত চলে যায়। তার স্ত্রী, মানে নিশির বোন খুশি এমনিতে বেশ হাসি-খুশি মেয়ে। কিন্তু স্বামী টলতে টলতে মাঝরাতে বাসায় ফিরছে—

ব্যাপারটা তার চোখে জ্বালা ধরায়।

ধরালে কি হবে, মানু অনেক রকম জাদু জানে। সে নিজেকে 'ম্যানিজিং ম্যান' বলে দাবি করে। যেদিন খুশির মুখে ব্যথার রঙ খেলা করে সেদিন সে একেবারে বদলে যায়। স্ত্রীর প্রতি আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ছাড়ে। সোনার দোকানের বিল ঝটপট পরিশোধ করে দেয়। নতুন শাড়িটাড়ির ব্যবস্থা হয়ে যায়। তা ছাড়া খুশির যদি অন্য বিশেষ কোন দাবি থাকে…

গত বছর অক্টোবর মাসে মানুর এইরকম বেসামাল অবস্থায় খুশি একটা দাবি আদায় করে নিয়েছে। 'অ্যাই, শোনো, নিশি তো আই.এ.তে খুব ভাল রেজাল্টা করেছে। আব্বা-আম্মা খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছেন, কোথায় ওকে ভর্তি করবেন। গোপালগঞ্জ কলেজের অবস্থা তো তুমি জানো! ঢাকায় মেয়েদের হোস্টেলে থেকে যদি অনার্স পড়তে পারে ইউনিভার্সিটি কিংবা…'

জড়ানো গলায় মানু বলেছে, 'কেন, আমার রূপসী-গুণবতী শ্যালিকা হোস্টেলে থাকবে কেন? আমার বাসায় কি থাকার জায়গা নেই?'

'আছে, তবু ভাবছিলাম, তোমার যদি কোন আপত্তি থাকে…'

পনেরো মিনিট ধরে হেসেছে মানু। 'কি যে বলো তুমি! লোকে সুন্দর সুন্দর পুতুল আর মূর্তি দিয়ে ঘর সাজায়। আর আমার বাড়িতে রক্ত-মাংসের সুন্দরী যুবতী হেসে কথা বলে সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াবে, এতে আপত্তি করলে তো দোজখেও আমার জায়গা হবে না, খুশিয়া বেগম। ওকে চলে আসতে বলো।'

'তা না হয় বললাম। কিন্তু ওর ভর্তির সমস্যা দেখবে কে? নিশি কখনও ঢাকায় আসেনি। আমিও তেমন কিছু বুঝি না। আর তোমার

তো এই ব্যস্ততা!'

খুশির কটিদেশে আর্ম ফোর্স মার্চ করিয়ে দিয়ে মানু বলেছে, 'ডোন্ট ওঅরি, সুইট খুশিয়া, সব ঠিক হয়ে যাবে। জাফরকে বলে দেব। ও যা করার করবে।'

'জাফর? অসম্ভব। ও এসব ব্যাপারে আমার চেয়েও আনাড়ি। ফাঁকতালে কীভাবে যেন বি.এ.টা পাস করে গিয়েছিল, তাও প্রাইভেটে। নইলে আর ভার্সিটির ডিগ্রি ওর কপালে জুটত না।'

মানুর মৃদু দংশনে কুঁকড়ে ওঠে খুশি। তার সাড়া পাবার অপেক্ষা করতে করতে মানু বলল, 'কিন্তু আমাদের ব্যবসার বারো আনা ঝক্কি জাফরই সামলায়।'

'এটা অন্য ব্যাপার।'

'ও, তা হলে বশিরকে বলব। বশির তো ঢাকা ভার্সিটি থেকে অনার্স, এম.এ. করেছে। ওর কাছে নিশ্চয় সব পানির মত সোজা!'

নিশ্চিন্ত হয়েছে খুশি। এবার মানুর দংশনের সাড়া দেওয়া যায়।

খুশির চিঠি পেয়ে পরের সপ্তায় ঢাকায় চলে এসেছে নিশি। বশির সাহায্য করতে রাজি হলেও প্রথমদিকে নিজে ঘোরাঘুরি করার সময় পায়নি। শুধু বুঝিয়ে দিয়েছে নিশিকে— কোথায় যেতে হবে, কী করতে হবে। ওই সময় রূপগঞ্জে নতুন কনস্ট্রাকশনের কাজে হাত দিয়েছে ওদের ফার্ম। কুইন্স সয়াবীন অয়েল রিফাইনারির জটিল কাজ।

ঘোরাঘুরিই সার হয়েছে নিশির। ক্লান্তিকর, বিশ্রী কাজ। কোথাও কোথাও বেশ অপমানজনক। ভর্তি হওয়া সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত বশিরকে হাত লাগাতে হয়েছে, নিশির পাশে পাশে ছুটতে হয়েছে সমানে। কিছু ধাক্কা খেতে হয়েছে তার পরও, তবু কাজটা

হয়েছে। হিস্ট্রিতে অনার্স কোর্সে ভর্তি হয়ে গেছে নিশি। ইরাজ বশির কপালের ঘাম মুছে বলল, 'বাপরে! একটা ব্রিজ কনস্ট্রাকশনও এর চেয়ে সহজ। আমাদের সময়ে এত ঝুট-ঝামেলা ছিল না।'

জাফর আড় চোখে নিশির মুগ্ধতা লক্ষ করে ঠোঁট উলটেছে। 'দরকার কী এত ঝুট-ঝামেলায়? এম.এ.পাস করো আর ডক্টরেট করো, শেষ পর্যন্ত সেই হাঁড়িই ঠেলবে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা তো আর রোজগার করবে না!'

নিশি হেসেছে। 'আপনি শুধু কাঁড়ি কাঁড়ি টাকাই বোঝেন!'

খুশি খুবই খুশি। 'ওর কথা বাদ দেন, বশির ভাই। আপনি অনেক কষ্ট করেছেন। বলেন, কী খাবেন?'

খাওয়াদাওয়ার কথায় নড়েচড়ে বসে জাফর। 'ভাবী, বশির মিয়া লজ্জায় মরে যাচ্ছে। ওর পক্ষ থেকে আমিই বলি। মোরগ পোলাও আর পাঙাশ মাছের...'

তার কথা শেষ হবার আগেই হইহই করে উঠেছে মানু। 'সঙ্গে দই আর কাঁচা গোল্লা হলে কেমন হয়?'

মানুর পিঠে খোঁচা দিয়ে খুশি বলে, 'নাটোরের লোক কাঁচাগোল্লা ছাড়া আর কী বোঝে?'

'বেশ, আমি না হয় নাটোরের লোক। এই যে আমার পার্টনাররা বসে আছে। বশিরের বাড়ি কুষ্টিয়া আর জাফরের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ওদের জিজ্ঞেস করে দেখো ওরাও কাঁচাগোল্লার ভক্ত কি না।'

জমজমাট পার্টি হয়েছে সেদিন। একজন বাড়তি অতিথি জুটেছে। নিশির বান্ধবী— মোরশেদা। গোপালগঞ্জ কলেজে ওর সঙ্গে পড়ত। ওর বাবা ফুড ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেন। গত বছর

বদলি হয়ে এসেছেন ঢাকায়। গোলগাল আকারের এই মেয়েটি দাবি করে, সে নিশির সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। নিশিকে না দেখে সে একবেলাও থাকতে পারে না। নিশিও নাকি মোরশেদার চেয়ে ভাল বান্ধবী কখনও পায়নি।

নিশিকে এ-ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছে। খুশি অনেক রগড় করার পর বলেছে, 'কি রে, তোর সেরা বান্ধবীর নাম তোর মুখে তো আগে কখনও শুনিনি! গোপন প্রেম নাকি?'

নিশি আশ্বিনের ঝড়ো রাতের মত রহস্যময় হাসি হেসেছে। 'তোমরা যা বলো, তাই বলো। আমার কিছু যায়-আসে না।'

একটা ব্যাপার অবশ্য সবার কাছেই রহস্যময়। এমনিতে নিশি আর মোরশেদার মধ্যে স্বভাবের অনেক অমিল। নিশি মোটামুটিভাবে রাজনীতি সচেতন। মুক্তিযুদ্ধ আর স্বাধীনতার বিষয়ে তার আগ্রহটা কখনও কখনও 'ক্রেজ' মনে হতে পারে অন্যের কাছে। কিন্তু একটু সহৃদয়তার সঙ্গে ভাবলে দেখা যাবে ক্রেজ-টেজ কিছু নয়, দেশের মুক্তির জন্য এত মানুষের অকাতর আত্মদান ওর কাছে একটা সাংঘাতিক ঘটনা। ওর একটা মস্ত দুঃখ, মুক্তিযুদ্ধের আগে ওর জন্ম হয়নি। যদি এক-আধটা স্মৃতি থাকার মত বয়সও হত, এত দুঃখ হত না। স্বাধীনতা আর মুক্তিযুদ্ধ অশ্রদ্ধা বা তাচ্ছিল্যের চোখে দেখাও অনেক মানুষের অভ্যেসে পরিণত হয়েছে। ওই সব লোকের নাম মুখে আনতেও ওর ঘৃণা হয়। তা ছাড়া কোন রাজনৈতিক বিতর্কের গন্ধ পেলে নিশি পারলে মাটি কামড়ে সেখানে পড়ে থাকে আর কি। চট করে মন্তব্য করে না, কিন্তু গভীর মনযোগে গিলতে থাকে বিতর্ক।

মোরশেদা কিন্তু রাজনীতির ধারে-কাছে নেই। হয়তো কখনও

চায়ের আসরে তুফান তুলেছে মানু আর তার দুই বিজনিস পার্টনার। খুশি চেষ্টা করছে কান খাড়া করে বিরোধের মূল বিষয়গুলো বুঝতে। মোরশেদা তার গলা জড়িয়ে ধরে। 'লক্ষ্মী আপা, অন্য ঘরে চলেন না! আপনার সেই মেরুন রঙের শালটা একটু দেখব। ওতে যে নকশাটা আছে, ঠিক ওইরকম নকশা...'

নিশি অন্তর্মুখী স্বভাবের। কিন্তু মোরশেদা সারাদিন আড্ডা ভালবাসে। বই পড়া আর গান শোনার বাতিকের জন্য নিশিকে বিস্তর বকাঝকা করে। নিশি অশ্লীল রসিকতা পছন্দ করে না। কিন্তু মোরশেদা মাঝে মাঝে নিশিকে একা পেলে এমন চুটকি ছাড়তে শুরু করে যে নিশির কান লাল হয়ে ঝাঁ-ঝাঁ করতে থাকে। কিন্তু এত অমিল সত্ত্বেও মোরশেদার আকর্ষণ এড়াতে পারে না নিশি। ওর সঙ্গ পরিহারের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। দু'দিন সে না এলে নিশি নিজেই একসময় গিয়ে উপস্থিত হয় মোরশেদার বাবার শাহজাহানপুরের বাসায়।

কিন্তু ওদের কথা এখন আর নয়। আমাদের নায়িকা বিষণ্ন মনে বসে আছে কাঠের বাঙলোর সিঁড়িতে। ঘণ্টাখানেক আগে ওদের দলটি এসে পৌঁছেছে ন্যাশনাল পার্কের কোণার দিকের এই অখ্যাত বাঙলোটিতে। নিশি প্রথমে আপত্তি করেছিল। আসতে চায়নি। খুশি অবশ্য কটিজটির অনেক গল্প করেছে। নিশি নাকি সেখানে একবার গেলে আর ফিরতেই চাইবে না। তাতে নিশিকে খুব একটা আগ্রহী মনে হয়নি। খুশি ওকে একটা উপন্যাস পড়তে দিয়েছে। 'বর্ষা রাতের শেষে।' তারপর জিজ্ঞেস করেছে, 'কি রে, জায়গাটা দারুণ মনে হচ্ছে না?'

নিশি অগত্যা হেসেছে। উপন্যাসটা পড়লে অবশ্য ওই জায়গা

সম্পর্কে একটা মোহ তৈরি হয় মনে। কিন্তু তার মূল কারণ তো কাহিনী। কাহিনীর পটভূমি। তা ছাড়া নিশির আগ্রহ না হবার আরও কারণ আছে। সে কী করবে জঙ্গলে আউটিংএ গিয়ে? খুশি তার বরের সঙ্গে রোম্যান্স জমাবে। মানু বউয়ের কানে কানে বলবে, 'আমি বারবার নতুন করে তোমায় পেতে চাই।' জাফর আর বশির দিব্যি ঘুরে বেড়াবে বনে-বাদাড়ে। অ্যাডভেঞ্চার। ওরা নাকি একটু-আধটু হার্ড ডিঙ্কসও নেয়, নিশি শুনেছে। রান্নাবান্নার জন্য বেবির মাকে সঙ্গে আনা হয়েছে। তার মানে সবাই যে যার ব্যস্ততায় বিভোর থাকবে। সে কী করবে? পড়া আর গান শোনা? তার জন্য বনানীর ২৩ নম্বর রোডের ৯৭ নম্বর বাড়িটা কি খুব খারাপ? কিন্তু খুশি তাকে একা বাসায় রেখে যেতে একটুও রাজি নয়। তা ছাড়া মোরশেদা এসে যখন হইচই শুরু করল, নিশির আপত্তি ধোপে টিকল না।

মাইক্রোবাস নিয়ে চলে এসেছে ওরা। ড্রাইভারকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। ড্রাইভ করেছে মানু। অনেকদিন পর একটানা বিশ মাইল গাড়ি চালিয়ে সে বেশ ক্লান্ত। বিশ্রাম নিচ্ছে কোণার রুম দখল করে। বশির গেছে খড়িকাঠ আর রান্না-ধোয়ার কাজের জন্য পানির ব্যবস্থা করতে। জাফর মাইক্রোবাস থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে ক্যাবিনে তুলছে। বাঙলোয় ছোট-বড় মিলিয়ে ক্যাবিনের সংখ্যা ছয়। সবচেয়ে বড়টিতে থাকবে মানু আর খুশি। ওদের পাশের ছোট ক্যাবিন দেওয়া হয়েছে নিশি আর মোরশেদাকে। এরপর ব্যালকনি আর ডাইনিং স্পেস পার হয়ে যে-দুটো মাঝারি আকারের ঘর—সেগুলো বশির আর জাফরের জন্য বরাদ্দ করেছে মানু। রান্নাঘরের সঙ্গে লাগোয়া ঘরে বাংলোর কেয়ার টেকার থাকে। বেবির মাকে

সেখানে রাখতে চায় খুশি। কেয়ার টেকারের নাম অবিনাশ। সে অবশ্য খুশির অনুরোধ শুনেই বিছানাপত্র নিয়ে কেটে পড়েছে।

'কোথায় থাকবেন আপনি?'

লোকটি দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলেছে, 'আমাকে নিয়ে ভাববেন না। আউট হাউজ খালি আছে, ওখানে থাকতে পারি। তা ছাড়া গেটের বাইরে দারোয়ানদের ডরমিটরি আছে না? ওখানেও ঘর খালি আছে।'

খুশি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। বেবির মা কাছে না থাকলে খুশি বড় অস্বস্তি বোধ করে। শুধু রান্নাবান্না নয়, খুশির অনেক ব্যক্তিগত ঝামেলায় ত্রাণকর্ত্রী হয়ে যায় প্রৌঢ়া। তাকে সঙ্গে নিয়ে গাছকোমর বেঁধে রান্নাঘরে ঢুকেছে খুশি। রান্নাঘরের অবস্থা খুব খারাপ। গত বছর শীতে ওরা প্রথম আসে এখানে। দু'দিন ছিল। তখন বেশ চকচকে হাল ছিল বাঙলোর। কিন্তু এবার চিমসানো অবস্থা দেখে হতাশ হয় খুশি। মনে হচ্ছে গত দু'তিন মাসে কেউ আসেনি এখানে।

নিশি তাকিয়ে ছিল শাল আর কেওড়ার সুশৃঙ্খল বিন্যাসের দিকে। রান্নাঘর থেকে গলদা চিংড়ি ভাজার গন্ধ আসছে। কে যেন হো হো করে হেসে উঠল আউট হাউজে। কে? বশির? জাফর? না কেয়ার টেকার?

কাছেই একটি গাছের সরু ডালে এসে বসল একটি পাখি। আর একটি পাখি— একই রকম দেখতে— কাছে এসে বসে; তাকে আদর করতে শুরু করে। তিন রঙা, সুন্দর পাখি। মহিয়সীর মত কাঁধ বাঁকায়। নিশি পাখিগুলোর নাম জানে না। রবীন্দ্রনাথ

বলেছিলেন, 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি?' নিশির মনে হলো, সামান্য এই বাংলাদেশেরই বা কতটুকু জানা যায়?

কাঁধের কাছে পুরুষালি নিঃশ্বাসের শব্দ। দ্রুত ফিরে তাকায় নিশি। 'কেমন লাগছে, সুন্দরী শ্যালিকা?'

'ভালই।'

'পাখিদের প্রেম করতে দেখে কী মনে হচ্ছে?'

নিশির মুখ সন্ধ্যাকাশের রঙ ধরে। 'কী আবার মনে হবে?'

'ন্যাকামি কোরো না। কাকে বেশি ভাল লাগে, বলো। জাফর হাসান খানকে? না ইরাজ বশিরকে?'

'বলব না।'

মানু মুখ আরও সরিয়ে আনল। নিশির কানে কানে বলল, 'একজন কিন্তু তোমার জন্যে মনে মনে পাগল হয়ে আছে।'

বশিরের নাম শোনার জন্য উৎকর্ণ হলো নিশি। কিন্তু মানু বলল, 'জাফর।'

দুই

জাফর অসময়ে ঘুম দিয়ে উঠল। সন্ধে নামছে। শীত যায় যায় করেও যায়নি। বাতাসে ঠাণ্ডা ভাব আছে এখনও। দুপুরের

খাওয়াদাওয়া শেষ হয়েছে তিনটের দিকে। চারটে কিংবা সাড়ে চারটে পর্যন্ত চলেছে গল্প-গুজব আর তাস খেলা। মাঝে মাঝে আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল বলে এম.ডি. সাহেবের ধমক খেয়েছে।

'কী ব্যাপার, জাফর? আউটিং-এ এসেও তুমি ঘড়ি দেখবে? টেণ্ডার ওপ্‌নিং-এর মীটিং আছে? না শিল্প ব্যাঙ্কের বড় সাহেবদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট?'

জাফর বিব্রত হয়। 'ঘড়ি? কই, ঘড়ি দেখছি না তো!'

তাস খেলা জমছিল না। খুশি নতুন ব্রিজ খেলা শিখেছে, ভুল কল দিয়ে বেজায় লস করিয়ে দিচ্ছিল পার্টনার বশিরকে। বশির ভাল খেলে। কিন্তু পার্টনার হাতে তিনটে হার্টস্ কার্ড নিয়ে ফোর হার্টস্ পর্যন্ত ডাক দিলে সে কী করতে পারে? প্রতিপক্ষের হাতে ছ'টা হার্টস্, তাও আবার জাফর একা পেয়েছে পাঁচটা। ফোর হার্টস্-এ ডাব্‌ল্ হেঁকে তিনশো শর্ট আদায় করে নিল। মানুর মুখে হাসি আর ধরে না। 'সাবাশ, পার্টনার!'

বশির অবশ্য খেলতে বসে কখনও মেজাজ খারাপ করে না। ব্যাপারটাকে ছেলেমানুষি মনে হয় তার কাছে। খেলা খেলাই। জীবন-মরণ লড়াই নয়। খুশি তাই তাকেই বেছে নেয় পার্টনার হিসেবে। নিশি এসে খুশির পেছনে কিছুক্ষণ বসেছে। খেলাটা শিখে নিলে মন্দ হয় না। লং জার্নিতে ব্রিজ খেলাটা বেশ কাজে দেয়। খুশির কল ভুল হচ্ছে— বুঝতে পেরে সে ঘনিয়ে বসে দুলাভাইয়ের কাছে। ইন্টারেস্টিং খেলা। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারে, খেলার দিকে তার মন নেই। সে ঘোর-লাগা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বশিরের দিকে।

কী আছে বশিরের মুখে? কোন বৈশিষ্ট্য নেই। না, একটু ভুল হচ্ছে নিশির। তার চোখদুটো চমৎকার। গভীর, অন্তর্ভেদী এবং শেষপর্যন্ত পুরুষালি। কিন্তু শুধু একজোড়া চোখের অস্ত্রে লোকটা নিশির মত মেয়েকে ঘায়েল করবে— এ একটা কথা হলো? তখন নিশির চোখে আরও দুটো বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। বশিরের শরীরে কোথাও বাড়তি মেদ কিংবা পেশী নেই। তার হাসিটিও চিত্তরঞ্জনের ক্ষমতা রাখে। অনেকের মানসিকতা আর হাসি-কথার মধ্যে ব্যবধান থাকে। কিন্তু বশির সে-রকম নয়। তার কথা আর হাসি যেমন স্বচ্ছ, ঋজু, তেমনই তার মন। সে ভিতরে ভিতরে কালিমা পুষে রাখতে পারে না। নিশি হঠাৎ বেপরোয়া হয়ে ওঠে, কল্পনা করে, খুশির বদলে সে-ই খেলছে বশিরের পার্টনার হয়ে। খেলার সীমানা তাস ছাড়িয়ে কখন যেন অন্য জীবনের দেশে চলে যায়। অন্য খেলা। অন্য রকম ডাক। তার মনে হয়, শ্রাবণের চেয়ে অনেক বেশি ঢল নামাতে পারে সে, যদি কেউ একবার মেঘ হয়ে ডাক দেয়। মনে হয়, বসন্ত রাতের চেয়েও মধুর পূর্ণিমায় ভরিয়ে দিতে পারত কেউ যদি তার মাধবী বনে ফুল হয়ে ফুটত। ওই লোককে এই কথাটা যদি জানানো যেত! ভাবতেই মুখ লাল হয়ে ওঠে। শরীরের শিরায় শিরায় রক্তের অকারণ হুটোপুটি শুরু হয়।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে বশিরের মনের তল পাওয়া যায় না। কখনও কখনও তার চোখে আবেশ ভর করে। স্বর এমনিতেই ভারি; সেই সময় আরও গাঢ় হয়ে ওঠে। এইরকম একটা মুহূর্তে সে নিশিকে 'তুমি' বলে ফেলেছে। পরে পালটাতে চেষ্টা করেও আর পারেনি; কিংবা বলা যায়, নিশির অনুরোধে 'তুমি' সম্বোধন চালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। মানু বা খুশি— কারুর কানে বাজেনি বশিরের

পরিবর্তনটা। কারণ জাফর প্রথম থেকেই নিশিকে 'তুমি' বলে। বশিরও 'তুমি' সম্বোধন করবে— এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

ব্যস, ওই পর্যন্তই। বশির আর একটুও অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করেনি। নিশি প্রায় রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করেছে। জানে না, বশির ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছে না ভয় পেয়েছে। কিসের ভয়, তাও বোঝার উপায় নেই। বরং লজ্জার উঁচু পাঁচিল টপকে নিশি আরও খানিকটা আগে বাড়তে চেয়েছে। সেদিন অসময়ে দু'জনে একসঙ্গে ফিরে আসছিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। মানুর গাড়িটা ছিল না ওদের সঙ্গে। দুপুরের খাওয়ার সময় পেরিয়ে গেছে। খিদে লেগেছে নিশির।

মুখ ফুটে বশিরকে জানাতে হলো না। বশির ওকে নিয়ে গেল শাহবাগের একটা মিনি চাইনিজ রেস্তোরাঁয়। 'চলো, কিছু খেয়ে নিই।'

নিশি দুর্বল স্বরে প্রতিবাদের চেষ্টা করে, 'আমার···তো···খিদে নেই।'

'খিদে না থাকলে কিছু খাওয়া যাবে না— কে বলল?'

ভালই লাগছিল খাবারগুলো। হঠাৎ কারেন্ট চলে গেল। অচেনা জায়গায় নিশি অন্ধকার সহ্য করতে পারে না। সে সরে এসে বশিরের শরীর ঘেঁষে বসল। শুধু কি ভয়ের জন্য? লোকটাকে একটু পরীক্ষা করার কোন গোপন ইচ্ছে কি মনের কোণে ছিল না? নিশি নিজের সঙ্গে এই ব্যাপারে বোঝাপড়া করার সময় পায়নি। কিন্তু শেষ হয়ে গেছে পরীক্ষা। বশিরের দুর্বলতা ধরা যায়নি। কোন সুযোগই নেয়নি সে। চেষ্টা করেনি কোনরকম বাড়তি ঘনিষ্ঠতার।

এইসব ভাবনার মাঝখানে হয়তো কোন অসতর্ক মুহূর্তে নিশির

চোখে দুর্বোধ শূন্যতা খেলা করেছে। মানু হাত উঠিয়ে শ্যালিকার চোখের সামনে আঙুলের অদ্ভুত সব মুদ্রা তৈরি করে। চমকে ওঠে নিশি।

মানু তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলে, 'কী খবর, রূপসী শ্যালিকা? কাহিনীর কোন পর্ব চলছে? রাগ না অনুরাগ?'

নিশি চোখ পাকায়। কিন্তু বেশ উঁচু শব্দে বলে, 'মানে!'

স্বর আরও নামিয়ে মানু বলে, 'শুনলাম, আমার পার্টনার তোমার কাছে প্রেম নিবেদন করেছে! ছেলে কিন্তু ডাঁশা, আগেই বলে দিলাম।'

ঠোঁট উল্টে নিশি বলল, 'পার্টনার যে আপনার একজন নয়, দুলাভাই। কার কথা বলছেন?'

জাফর ক্লাবসের তিনকড়া দিয়ে রাজা-রানী মারল। মোক্ষম ট্রাম্প। কিন্তু খেলায় আর তার মন নেই। এম.ডি. সাহেবের চাপা স্বরের কথার মধ্যে আকর্ষক একটা সুর আছে, দৃষ্টিতেও আছে পজিটিভ ইঙ্গিত। কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে এত ইশারা, এত ভাব বিনিময়, তাকে ঠিক বোঝা যায় না।

উদাস মার্চের উইকএণ্ডে মায়াবী বনের কটিজে মেয়েটিকে সুযোগমত পাকড়াও করতে হবে। জানতে হবে তার মনের কথা, জাফর সিদ্ধান্ত নেয়।

ব্রিজ আর ভাল লাগছে না। উঠে পড়ে জাফর। মানু নিশির হাত ধরে সামনে বসিয়ে দেয়। 'বসো তো, রূপসী শ্যালিকা।'

'দুলাভাই, আমি তো ব্রিজ জানি না।'

'জানতে হবে না তোমার। শুধু বসে তেরোটা তাস গুণে

সাজিয়ে নাও, বাকিটা আমি সামলে নেব। তোমার আপাও ব্রিজের কচু জানে।'

দুপুরবেলা খাওয়ার পর ঘুমোনোর অভ্যেস আছে জাফরের। সে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়তেই টের পেল, ঘুম তাকে তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঘুম যেন হাঙর, তাকে খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল এই সমুদ্রে। ডুবে যেতে যেতে সে কল্পনা করে, গভীর অন্ধকারে নিশির হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সে। নিশি চিৎকার করছে, 'বাঁচাও! বাঁচাও!' ছুটে আসছে বশির। জাফর এরপর দেখতে পায় সে একাই হারিয়ে যাচ্ছে গভীর অন্ধকারে। নিশি তার হাত ফস্কে গেছে। তারপর আর কিছু দেখতে পায় না সে। ঘুমের মত অন্ধকার নামে তার চারপাশে। অথবা সত্যি ঘুম নেমে আসে পৃথিবী অন্ধকার করে।

তার ঘুম ভাঙল সন্ধের ঠিক আগের মুহূর্তে। শাল আর কেওড়া গাছের ডালে নীড়ে-ফেরা পাখিদের তুমুল কূজন চলছে। পশ্চিম আকাশে দিগন্ত রেখার সামান্য ওপরে সিঁদুরের মত রেঙে উঠেছে মেঘ। কোথায় যেন একই সঙ্গে শঙ্খ বেজে ওঠে আর আজান দেয় মুয়াজ্জিন। জাফর চোখমুখ ধোয়ার জন্য বাথরুমের দিকে এগিয়ে যাবার সময় হঠাৎ ধাক্কা খায় মোরশেদার সঙ্গে।

'সরি, দেখতে পাইনি।'

মোরশেদার চোখে ট্যারা হাসি, জাফরের চিনতে ভুল হয় না। জাফর আবার বলল, 'ব্যথা পেয়েছ?'

মোরশেদার চোখের হাসি মুখে ছড়িয়ে পড়ে। 'হ্যাঁ। ভীষণ ব্যথা। এখন কী করবেন? সারিয়ে দিতে পারবেন?'

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বাথরুম থেকে ফিরে আসে জাফর। ভেবেছিল, মোরশেদা সরে পড়েছে। এই রকম ইঙ্গিত বুঝতে

বোকারও সময় লাগবে না। চোখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে জাফর তাকিয়ে থাকে মেয়েটির দিকে। সে আসলে কী চায়?

মোরশেদা জাফরের বিছানায় বসে অলস ভঙ্গিতে। 'ব্রিজ খেলা ভাল লাগল না?'

অকারণ প্রশ্ন। তবু জাফরের মনে হলো, প্রশ্নের উদ্দেশ্য অকারণ নয়। 'ব্রিজ খেলা আমার কখনোই ভাল লাগে না। ওরা ধরল, তাই।'

মোরশেদা এরপর হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে জাফরকে হকচকিয়ে দেয়। 'ওরা ধরল, তাই? নাকি, নিশিকে আপনার মনে ধরেছে—এইজন্যে?'

জাফর হাসল। বালিশের পাশ থেকে টেনে নিল সোনালি সিগারেটের প্যাকেট। একটা সিগারেট ধরিয়ে গলগলিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল নাক-মুখ দিয়ে। 'তুমি তো···চমৎকার করে কথা বলতে জানো! নিশির চেয়েও বুদ্ধিমতী তুমি।'

মোরশেদার শরীর মোচড়-খাওয়া ধোঁয়ার কুণ্ডলির মত এঁকেবেঁকে গেল। 'কি যে বলেন!'

'কি যে বলেন মানে! একশো পারসেন্ট খাঁটি কথা বলেছি। কেন, অন্য কেউ এ-কথা কখনও বলেনি তোমাকে? তুমি সুন্দরী, শিক্ষিতা, চৌকস···'

'হ্যাঁ, বলেছে।'

'কে? জানতে পারি?'

মোরশেদা একটু দ্বিধা করল। 'নিশি আপনাদের কিছু বলেনি?'

'নিশি আবার কী বলবে?'

পাবনার এস.পি. সাহেবের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। তার নাম আলী মাহফুজ। লণ্ডনে সি.এ. পড়ছে।'

জাফর মোরশেদার কাঁধে হাত দিল। ভঙ্গিটা এমন, যেন আবেগবশত হাতটা উঠে এসেছে। কিন্তু এটা জাফরের অভ্যেস। কি পুরুষ; কি নারী, শ্রোতার শরীরে হাত না ছুঁইয়ে সে কথা বলতে পারে না। বিশেষ করে অল্প বয়সের তরুণীদের বেলায় তার হাত অবাধ্য হয়ে ওঠে।

'মাই গড! মিস মোরশেদা যে এত সৌভাগ্যবতী, তা তো জানতাম না! কই, নিশি তো কখনও বলেনি!'

মোরশেদা হাসল। 'নিশি, ওর আপা, দুলাভাই—সবাই জানেন।'

জাফর মোরশেদার কাঁধ থেকে হাত সরাল না। নতুন করে মেয়েটিকে ভাল লাগছে। 'আরও আগেই এই তথ্য জানা উচিত ছিল আমার।'

জাফরের ভারি স্বরে অনুশোচনা না আনন্দ— কোনটা বেশি— বুঝতে পারে না মোরশেদা। কিন্তু ওই মুহূর্তে জাফরের সঙ্গ তার কাছে অপরিহার্য আবশ্যক হয়ে ওঠে। সে ভিরু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কেন, জাফর ভাই?'

জাফর সরাসরি উত্তর এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। 'থাক সে কথা। পৃথিবীতে কখনও ভাগ্যের সুষম বণ্টন হবে না। কেউ তোমার মত সৌভাগ্যের ভাগীদার হবে, আর কেউ দুর্ভাগ্যের বোঝা বয়ে বেড়াবে আমার মত। এটাই নিয়ম।'

হাসল মোরশেদা। 'আপনি খুবই সেন্টিমেন্টাল।'

জাফর কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'সত্যি কথাটা বলব, মোরশেদা? আমি এরকম ছিলাম না। তুমিই আমাকে সেন্টিমেন্টাল করে তুলেছ।'

মোরশেদা তার ঈষৎ স্থূল শরীর কাঁপিয়ে হাসতে থাকল। 'কি যা-তা বলছেন? আমি? না···নিশি?'

জাফরের হাত মোরশেদার কাঁধে বাধা না পেয়ে ছোটাছুটি শুরু করে। 'শোনো, গোপনে তোমাকে একটা কথা বলি। নিশির চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর তুমি।'

মোরশেদার হাসি থামল। একটু একটু কাঁপছে সে। 'যাহ, বিশ্বাস করি না।'

জাফর বলল, 'প্রমাণ চাও?'

মোরশেদা কিছু বলল না।

'কবে দেশে ফিরবে তোমার হবু বর?'

'এই তো···অক্টোবরে। তখন বিয়ে।'

মেয়েরা যখন বিয়ের কথা বলে ওদের ভারি সুন্দর দেখায়—ব্যাপারটা আগে কখনও লক্ষ করেনি জাফর হাসান খান। তার দু'চোখে নিঝুম রাত নেমে আসে মোরশেদার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে। সে গলার স্বরে অদ্ভুত এক মাদকতা ফুটিয়ে বলে, 'আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে? বেশিক্ষণ লাগবে না, এই ধরো, আধঘণ্টা।'

'কোথায়?' আধা ভয়ে, আধা কৌতূহলে লাল হয়ে জিজ্ঞেস করে মোরশেদা। জাফরের জীবনে সে প্রথম নারী নয়। জাফর তার মনের পরদার টেল-আপগুলো পড়তে পারছে। মোরশেদাও কিছু অধরা-অনাঘ্রাতা নয়। সে যে জাফরের ভাষার আড়ালের ভাষা বুঝতে পারছে, সন্দেহ নেই।

জাফরের পাশে হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকার ভেঙে এগুতে থাকে লণ্ডনের কোন এক হবু চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের হবু স্ত্রী। সিঁড়ি দিয়ে

নামার আগে একবার উঁকি দেয় মাস্টার বেডরুমে। ব্রিজ তখনও চলছে। নিশি ভালই আয়ত্ত করে ফেলেছে খেলাটা।

বাঙলোর পেছনদিকের বাউণ্ডারি ওয়ালে ছোট গেটটা খোলা ছিল। ওধারে ক্রোটনের ঝাড়ের আড়ালে কংক্রিটের প্ল্যাটফর্ম। দু'তিনটে চৌবাচ্চা আর আণ্ডারগ্রাউণ্ড ট্যাংক আছে। সবশেষে পাওয়া গেল লোহার সিঁড়ি। বিশফুট উঁচু ওভারহেড ট্যাংক।

'ভয় করছে, মোরশেদা?'

মোরশেদা একটু একটু ভয়ের কথা স্বীকার করতে যাচ্ছিল, তার আগেই কাঁধে উষ্ণ নিঃশ্বাস পেয়ে মুখের কথা বুকে লুকিয়ে ফেলল। পিছন থেকে জাফর জড়িয়ে ধরেছে তাকে।

রুদ্ধশ্বাসে মোরশেদা জিজ্ঞেস করল, 'ওপরে?'

'হ্যাঁ। সাবধানে সিঁড়িতে পা রেখো। ভয় পেয়ো না, আমি কাছেই আছি।'

এরপর সন্তর্পিত, সতর্ক নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে কত সেকেণ্ড, কত মিনিট কাটল মোরশেদা আর জাফরের, সে-খবরে আমাদের দরকার নেই। ওরা যখন বাঙলোয় ফিরে আসছে, মোরশেদার মনে হলো, দেয়ালের ছোট গেটটা প্রবলভাবে নড়ে উঠেছে। জাফরের টর্চটা তখন মোরশেদার হাতে। সে গেটের আশেপাশে আলো ফেলল।

জাফর জিজ্ঞেস করল, 'কী দেখছ?'

'মনে হলো···কি যেন নড়ে উঠল।'

'কিছু না, মনের ভুল।'

বাঙলোয় ফিরে মাস্টার বেডরুমে আবার উঁকি দেয় মোরশেদা। তাস খেলা শেষ হয়েছে। মুখোমুখি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে গল্প

করছে নিশি আর বশির। মোরশেদা মুচকি হেসে ফিরে তাকায়। জাফর তার নিজের ঘরে ফিরে গেছে। সে পা বাড়াল রান্নাঘরের দিকে। কেয়ার টেকার মুরগি এনে দিয়েছে। বেবির মা চুলো ধরাচ্ছে। খুশি কোমরে আঁচল জড়িয়ে নিয়ে রাঁধতে বসেছে।

সবাই আছে, মানু নেই।

তাসের প্যাকেট তুলে রেখে আড়মোড়া ভাঙল বশির। নিশি উঠে দাঁড়িয়ে তার পরনের শাড়ি ঠিক করল, পরিপাটি করল বিছানাটা। বশির নীরবে লক্ষ করে। নিশির প্রত্যেক নড়াচড়ার মধ্যে কি যেন একটা ব্যাপার আছে। নাচের মুদ্রা সম্পর্কে সে বিশেষ কিছু জানে না। জানলে হয়তো নিশির অঙ্গ সঞ্চালনের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারত।

আজ, এই মুহূর্তে হঠাৎ বশিরের মনে হচ্ছে, এই নারীটি তার। জন্ম-জন্মান্তর ধরে শুধু তাকে সঙ্গ দেবার জন্য, তার একাকীত্ব কাটানোর জন্য নিশি কাছে বসে আছে। অনেক সুযোগ পেয়েছে বশির। কিংবা বলা যায় নিশি তাকে যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু মনের কোন গোপন কথাই তাকে বলা হয়নি। অন্যমনস্কভাবে নিশির দিকে তাকিয়ে আছে বশির।

'কী দেখছেন?'

বশির খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়। 'তোমার কামিজটা চমৎকার। কোথায় পেলে অমন সুন্দর সিল্ক?'

নিশি হেসে বলল, 'সেদিন ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরার সময় আপনি বলছিলেন, প্রিন্টটা একটুও ভাল নয়। আসল কথা কোনটা? ওই সময় আপনার মনটা ভাল ছিল না?'

বশির ঘাবড়ে যায়। মেয়েটা কিছুই ভোলে না। সেদিন ঠিক কী কারণে কথাটা বলেছে মনে করার চেষ্টা করল বশির। নিশি বলল, 'বাদ দিন। ওটা কোন জরুরী বিষয় না। চা খাবেন আর এক কাপ?'

দুপুরের খাওয়ার পর দু'কাপ চা খাওয়া হয়ে গেছে। চা খাওয়ার ইচ্ছে আর নেই বশিরের। ওর তৃতীয় নয়নে ভাসছে একটা সোনালি বোতল— লাল লেবেল লাগানো। মানু দুপুরে একবার প্যাকেট থেকে বার করে দেখিয়ে চোখ মটকে ইঙ্গিত করেছিল। তারপর আবার পুরে রেখেছে প্যাকেটে। কখন ওই আসর বসবে? এবার পরিস্থিতি অবশ্য একটু আলাদা। দু'টি তরুণী আছে তাদের সঙ্গে। তারা আসরটাকে ভাল চোখে নাও দেখতে পারে। বশির হাই তুলে বলল, 'চা? না, ভাল লাগছে না। আচ্ছা, আমাদের এম.ডি. সাহেব কোথায় গেলেন বলতে পারো?'

নিশি বাঙলোর অন্য রুমগুলো ঘুরে এল। 'নেই। কোথায় গেছেন, কেউ জানে না।'

খুশি রান্নাঘর থেকে সন্ত্রস্ত মুখে উঠে এল। আঁচলে হাত মুছে বশিরের কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'ভাই, ও কোথায় গেল এই অন্ধকারে?'

বশির বলল, 'হুঁ, চিন্তার কথা।'

খুশি উঁকি দিল জাফরের ঘরে। ফিরে এসে বলল, 'প্রথমে ভেবেছিলাম, জাফর ভাইয়ের সঙ্গে বেরিয়েছে। কিন্তু উনি তো ফিরে এসেছেন। মোরশেদা বাইরে ঘুরতে গিয়েছিল। সেও ফিরেছে।'

নিশি বিছানার ওপর টর্চের দিকে ইঙ্গিত করল। 'আশ্চর্য ব্যাপার, টর্চও তো নিয়ে যাননি বস্। আচ্ছা, দেখি, কোনদিকে

গেলেন।'

নীরবে নিশির দিকে তাকিয়ে বিদায় চাইল বশির। নিশি তাকে বিদায় দিতে চায় না। খুশির গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আপা, আমিও যাই ওনার সঙ্গে—'

'যাবি? যা। সাবধানে থাকিস।'

পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করে দু'জনে। অনেকদিন ধরেই এমন করে হাঁটছে, তবু আজকের হাঁটা অন্যরকম মনে হচ্ছে নিশির কাছে। প্রবল ক্ষমতাধর অন্ধকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে এলিয়ে আছে শাল-কেওড়া গাছ। দূরে, আউট হাউজের চারপাশে জোনাকির মেলা। সম্মোহনী আবেশ তৈরি করেছে আউট হাউজ।

বশির মাঝে মাঝে টর্চের আলো ফেলছে। বেশির ভাগ সময়ই অন্ধকারে ডুবে থাকছে জায়গাটা। নিশির কাঁধের ওপর অভয়ের সবল হাত মৃদু চাপ দিল। বেতসলতার মত কেঁপে ওঠে নিশি। তার মনে হয়, তাদের দু'জনের নিঃশ্বাস ছাড়া অন্য সব শব্দ থেমে গেছে পৃথিবীতে। জোনাকির জ্বলা-নেভা ছাড়া আর কোথাও কোন আলো নেই। আর ছ'শো কোটি মানুষের এত বড় পৃথিবীতে তার সঙ্গী কেবল পাশের এই মানুষ।

আউট হাউজে পৌঁছে মৃদু স্বরে ডাক দিল বশির, 'অবিনাশ বাবু—'

কেউ নেই। ফিরে আসবে ভাবছে, এমন সময় ওরা দু'জনেই দেখতে পায়, বাঙলোর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে মানু। বারান্দা থেকে খুশি টর্চের আলো ফেলছে তার মুখে। নিশি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'চলুন, ফিরে যাই।'

বশির হঠাৎ আঁকড়ে ধরল নিশিকে। 'আমার একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি, নিশি। আজ বলতে চাই। এখানে এবং

এখনই।'

নিশি শালের পাতা ঝরার শব্দে বলল, 'বলো।'

তিন

দুপুরের গলদা চিংড়ির মালাই কারি বেশ কিছুটা বেঁচে গিয়েছিল। মানু বলেছিল, রাতে বেশি ঝামেলা করার দরকার নেই। মুরগি আর ভাত করলেই হবে। খুশিও তাই ঠিক করেছিল প্রথমে। কিন্তু রান্নাঘরে ঢুকেই তার চোখে পড়ে সবজির ঝুড়ি। হৃষ্টপুষ্ট বেগুনগুলো তাকিয়ে আছে। এমন চমৎকার বেগুন ঢাকায় চট করে দেখা যায় না। সবজিটা অবিনাশের সংগ্রহ। খুশি বঁটি পেতে ঝুড়ি টেনে নেয়। টাটকা বেগুন ভাজি বেশ জমবে মুরগির সঙ্গে।

কোটা শেষ হয়নি, এরই মধ্যে মাথা খারাপ করে দিল নিশি। দুলাভাই কোথায়, দুলাভাই কোথায়। প্রথমটায় খুশির মনে দুর্ভাবনা উঁকি দেয়নি। সে অবশ্য বারবার এঘর-ওঘর করেছে। কিন্তু একটা ব্যাপারে মানুর ওপর ভরসা রাখতে পারে সে। মানু সাবধানী লোক। অচেনা জায়গায়— বিশেষ করে অন্ধকারে— কোন ঝুঁকি নেবে না সে। দুর্ভাবনা দেখা দিল, যখন মানু ফিরে এল। টর্চের আলোয় তার মুখটা ভয়ঙ্কর দেখায়। কী হয়েছে তাঁর? খুশি খুঁজে বার করতে চেষ্টা

করে। একটু আগেও বেশ হাসি-খুশি দেখাচ্ছিল তাকে।

খুশি বেগুন ভাজার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। বড় কামরায় চলে আসে। মানু বাথরুমে ঢুকেছে। খুশি লোহার খাটের ওপর বসে উইণ্ডোসিলে হাত রাখে। বাতাসে আলোড়ন নেই। অন্ধকার বরফের মত জমাট বেঁধেছে শাল-মহুয়ার সুশৃঙ্খল বনে। কখন যেন সে-অন্ধকার ওর মনের ভিতর ঢুকে পড়ে। তার মানুষটা ওই রকম বদলে গেল কেন? নিপাট ভালমানুষ ছিল মানু। মফঃস্বল শহরের ছোট ছোট বাড়ির ভিতর মুখ-লুকানো এক স্কুলে পড়াত। তার জীবনের সবচেয়ে দামী চাওয়া ছিল এক ফুটফুটে সুন্দরী বউ আর শহরের এক কোণে পাঁচকাঠা জমির ওপর গোলপাতার ছাদ-দেওয়া একটা বাড়ি। তার নামও ঠিক করে রেখেছিল মানু। সত্যি বলতে কি, 'মায়াকুটির' নামের সেই মায়াঘোর আর নিম্নবিত্ত বিলাস থেকে টেনে বার করে তাকে বিত্তশালী হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছিল খুশিই।

বিয়ের পর যখন তাদের হানিমুন পর্ব চলছে, বউয়ের কানে কানে জীবন সংগ্রামের আনন্দ-বেদনার কথা বলছে মানু, খুশি প্রবল বেগে মাথা নেড়েছে।

'সারা জীবন ওই হিসেবের গণ্ডীতে আটকে থাকতে হবে? অসম্ভব!'

মানু আহত বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়েছে। তখন খুশির চোখে অন্য রকম ঘোর। 'তোমাকেও বড় হতে হবে।'

'গরিব মানুষরা কি সবাই ছোট, খুশিয়া বেগম?'

খুশি দারিদ্র্যের মধ্যে মহত্ত্ব বিষয়ে বড় বড় কথা শুনতে চায়নি। 'টাকা না থাকলে তোমাকে ছোট হয়েই থাকতে হবে।'

'তা হলে কী করতে বলো?'

'কী আবার? মাস্টারির মায়া ছাড়ো।'

'বেশ, ছাড়লাম। তারপর?'

খুশি তার আশৈশব স্বপ্নের জীবনের কথা বলেছে। সে-জীবনের রূপরেখা সে জানে, সীমানা জানে না। কিন্তু সব মানুষের মনেই তার স্বপ্নের একটা বাস্তব মূর্তি থাকে। খুশির বাস্তব মূর্তি তার ফুপাত ভাই আশরাফ মজুমদার। পূর্ত বিভাগের ঠিকাদারের সহকারী হিসেবে জীবনের কঠোর কঠিন মাটিতে পা রেখেছে। তারপর তরতর করে এগিয়ে যেতে যেতে একসময় নিজেই ঠিকাদার হয়েছে। ঠিকাদারি ব্যবসা একটু জমজমাট হতেই হাত বাড়িয়েছে শিল্পের দিকে।

শিল্প বদলে দিয়েছে আশরাফ মজুমদারের জীবন। সে কখনও স্বীকার করেনি, কিন্তু খুশি তো জানে, তার উন্নতির সিঁড়ি তৈরি করেছে চুনি ভাবী। জাদুকরের মত তাক লাগিয়ে দিয়েছে আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের। আশরাফ মজুমদারের বিল আটকে গেছে সরকারি অফিসে; চুনি ভাবী ছাড়িয়ে এনেছে। ব্যাঙ্ক লোন দিতে চায়নি। কিন্তু চুনি ভাবী ঠিকই জানেন, কোন তদবিরে কোন মকসুদ হাসিল হয়। লোন নিজেই এসে উপস্থিত হয়েছে আশরাফ মজুমদারের বাড়িতে।

একটা সত্য বুঝতে খুশির দেরি হয়নি। বড় হতে গেলে মানুষের মনে প্রতিযোগিতার মনোভাব আসা চাই। প্রতিযোগিতার জন্য চাই ঈর্ষা। আপসহীন ঈর্ষা। সে খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পেরেছে, মানুর যে সব গুণ আছে, বড়লোক হবার জন্য তা যথেষ্ট কিংবা তার চেয়েও বেশি। শুধু ঈর্ষার অভাব আছে তার। ইগোর

অভাব আছে। খুশি সাফল্যের সঙ্গে মানুর মধ্যে ঈর্ষার উত্থান ঘটায়। বহুতল ভবনের চেয়েও দ্রুত গতিতে ঈর্ষার আকাশ ছোঁয়া প্রাসাদ গড়ে উঠেছে মানুর মধ্যে, বদলে দিয়েছে তার জীবন আর স্বপ্নের দিগন্ত রেখা।

স্কুলের চাকরি ছেড়ে সামান্য কিছু টাকা পকেটে নিয়ে একহাতে একটা ভাঙা সুটকেস আর অন্য হাতে খুশির হাত ধরে সে যখন ঢাকায় চলে এল, কেউ ভাবতে পারেনি, জীবনের ম্যাজিকে মানু জুয়েল আইচকেও হারিয়ে দেবে।

এইভাবে বদলে গেল মানুষটা। খুশি নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তার মনে হয়, নিথর নিস্পন্দ শালবনের পাতায় পাতায় ধাক্কা খাচ্ছে দীর্ঘশ্বাস। সে মানুকে অতখানি বদলাতে চায়নি। সে শুধু বিত্ত চেয়েছিল। সে খুঁজে বার করতে চেয়েছিল ওপরে ওঠার সিঁড়ি— চুনী ভাবীর মত দ্রুত ছুটতে চেয়েছিল স্বামীর হাত ধরে। জানত না, বিত্তের আসল রহস্য চুরি— যা চিত্তকেও সর্বস্বান্ত করে দেয়।

কিন্তু মানু কি মনে মনে সত্যি কিছু দেউলিয়া হয়েছে? আশরাফ মজুমদারের ঘরের অনেক গোপন খবর খুশির কলজে কাঁপিয়ে দিয়েছে। চুনি ভাবীর গোপন কথাগুলোও তার কানে এসেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি উচ্ছন্নে-যাওয়া সমাজের স্ক্যাণ্ডাল কাহিনীকে হার মানাতে পারে— এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে তার জ্ঞাতসারে। কিন্তু খুশি সেসব ভেবে অকারণ নিজেকে ভারাক্রান্ত করেনি। সবাই কিছু সমান নয়। মানু আগাগোড়া অন্যরকম মানুষ। এই বিশ্বাস নিয়ে খুশি ভাল থাকতে চায় যে পদস্খলন হলেও সবাই আছাড় খায় না। কেউ কেউ টাল সামলে নিতে পারে। মানু সেই রকম।

আজ টর্চের আলোয় মানুর চোখে কী যেন দেখতে পেয়েছে

খুশি। নিজের কাছে কোন পরিষ্কার ব্যাখ্যা নেই এই খটকার। কিন্তু মন থেকে তাড়িয়েও দিতে পারছে না। মানুর চোখে অপরাধের চিহ্ন ছিল না। কিন্তু দৃষ্টিটাকে স্বাভাবিক বলাও মুশকিল। আরও একদিন তার চোখে ওই চিহ্ন দেখেছে খুশি। স্মৃতি হাতড়ে খুঁজে পেতে অনেকখানি সময় লাগল তার।

উত্তরার নতুন আবাসিক এলাকায় রোড কনস্ট্রাকশনের একটা শাঁসালো কাজ ছিল। সন্ধান এনেছে জাফর। যিনি কাজটা দেবেন, তাঁর দাবিও খুব বেশি নয়। কিন্তু দাবি শুনে বেঁকে বসেছে মানু ম্যানিজিং ডিরেক্টরের আপত্তি থাকলে ডিরেক্টরদের করার কী থাকে? বশিরেরও কোন সায় ছিল না। কিন্তু নিজেও তো কোয়াড করপোরেশনের ডিরেক্টর। ওদের তিনজনের মুখ চাওয়াচাওয়ি দেখে সে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

'কেন, কী এমন দাবি? আমি জানতে পারি না?'

জাফর হেসে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বশির আগেই উঠে পড়েছে। মানু উত্তর দিতে গিয়েও চেপে গেল। কিন্তু খুশি ছাড়েনি। গভীর রাতে অন্ধকার শয্যায় ম্যানিজিং ডিরেক্টরকে ধরেছে সে। 'এড়িয়ে গেলে যে! লোকটা কী চায়?'

মানু বলল, 'মেয়েমানুষ।'

খুশি হেসেই খুন। 'এটা একটা গোপন করার মত ব্যাপার হলো?'

মানু বিষম অবাক হয়েছে। 'কী বলতে চাও? ওই দাবি মেটাতে আপত্তির কিছু নেই? মেয়ে সাপ্লাই দিয়ে কাজ বাগাব?'

খুশি এম.ডি.কে খুশি করার চেষ্টা করল। 'কাজ কাজই, স্যার। কাজ মানেই লাভ। আমাদের দরকার লাভ। আগামী তিন মাসের

মধ্যে বিশ লাখ টাকার ব্যবস্থা করতে হবে, নইলে সাঁতারকাটি ব্রিজ কনস্ট্রাকশনের কাজটাও আমরা হারাব। তা ছাড়া আশরাফ ভাই বলেছেন জেমকন লিমিটেডের স্লিপারের ডিলারশিপটাও করিয়ে দেবেন।'

মানু রীতিমত হাঁপাতে লাগল। 'কী বলছ তুমি! ব্যবসা করি বলে এথিক্স জিনিসটাও মাটিতে পুঁতে ফেলব?'

মানুর পিঠে খুশির স্নেহময় হাত চঞ্চল হলো। 'দূর, তুমি একটা তুচ্ছ জিনিস খুব সিরিয়াস করে দেখছ। তুমি তো আর তোমার বউকে পাঠাচ্ছ না! এসব কাজের জন্যে কত মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! তা ছাড়া···ভেবে দেখো···তুমি এপথে না গেলেও অন্য কেউ না কেউ যাবেই।'

মানুর মুখে তাৎক্ষণিকভাবে কোন প্রত্যুত্তর এল না।

খুশি বলল, 'আশরাফ ভাই সেই জাপানি কন্ট্র্যাক্টটা কীভাবে পেয়েছিলেন, জানো?'

'না তো

'চুনী ভাবীর এক বান্ধবীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাকে একটা সোনার নেকলেস গড়িয়ে দিয়েছিলেন। মহিলা খুশিতে বাগবাগ। কাজ হয়ে গেল। খরচা পাঁচ হাজার টাকা। ওই কন্ট্র্যাক্ট থেকে আশরাফ ভাই নীট লাভ করেছেন পঞ্চাশ লাখ টাকা।'

ক্লান্ত শরীর বিছানায় এলিয়ে দিয়ে মানু বলেছে, 'আমি ওইসব লাইন চিনি না। বিএডিসি-র এক ইঞ্জিনীয়ারকে খুশি করতে গিয়ে ক্যালকন এন্টারপ্রাইজের হাজী সাহেব জোর ধরা খেয়েছিলেন।'

খুশি খুব হেসেছে। 'তুমি একটা ভিতুর ডিম। জাফর ভাইকে বলো, ও-ই সব ব্যবস্থা করবে। ওর সাহস আছে। লাইন-ঘাটও

জানে।'

কথাটা মিথ্যে ছিল না। জাফর খুশির সাপোর্ট পেয়ে প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে। এক সপ্তার মধ্যে আদায় করেছে কাজটা। এরপর অবশ্য আর সেব ব্যাপারে খুশিকে নাক গলাতে হয়নি। ঝামেলার কাজ দেখলেই মানু নির্ভর করেছে জাফরের ওপর। জাফর শুধু নিজের হাত পাকায়নি, ব্যবসাও পেকে উঠেছে। ফুলে ফেঁপে উঠেছে কোয়াড করপোরেশন।

তবে সব সময় সব কাজ নির্ঝঞ্ঝাট সারা গেছে, তা বলা যাবে না। বশির সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে খুশির সঙ্গে বিরোধে জড়ায়নি। মানুকেও অখুশি করেনি। জাফরের সঙ্গে তার বিশেষ বনিবনা হবে না— এটাও তারা ধরে নিয়েছিল। মানুকে একটু বেশি সতর্ক হতে হয়েছে। দু'দিকই সামলাতে হয়েছে তাকে। কখনও কখনও এই ব্যাপারে খুশির সাহায্য দরকার হয়েছে। খুশি অমত করেনি। গোলমাল মেটানোর ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে সে। বশিরের একটা দুর্বল দিক: তার পুঁজি খুব কম।

এক পর্যায়ে বশির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, আলাদা হয়ে যাবে। যা পারে, নিজেই করবে। গোলমেলে কাজের মধ্যে সে আর নেই। কিন্তু তার নিজের ভিতরেই গোলমাল বেধে উঠেছে— নিশিকে কেন্দ্র করে। কবে কখন যেন নিশি তার নিশিদিনের ধ্যানের প্রতিমা হয়ে গেছে। স্বপ্ন আপন শক্তিতে পথ তৈরি করে নিয়েছে। প্রবোধ দিয়েছে তার মনকে। 'বশির, ধৈর্য হারিয়ো না। যে সহে সে রহে। নিশিকে যদি তুমি সত্যি চাও...'

অন্ধকার ঘরের কোণে আরও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খুশি। নিশি আর বশির বিভোর হয়ে গল্প করছে বারান্দায়। আরও একটা

জটিল ঘটনাজালের ছায়া দেখতে পায় খুশি। বুঝতে বাকি নেই, জাফর নিশিকে পছন্দ করে। আভাসে-ইঙ্গিতে মনের কথাটা জানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু নিশি ভুলেও তার প্রতি কোনরকম দুর্বলতা প্রকাশ করেনি। কিন্তু মানু আর সে দু'জনেই সন্তর্পণে মাঝখানের পথ ধরেছে। জাফরকে খোলাখুলিভাবে কিছু বলেনি তারা। বশিরকেও বুঝতে দেয়নি তাদের মনোভাবের কথা।

এখনও অনেক পথ বাকি। কতটা—খুশি জানে না। পথ মাপার কাজটা মনে মনে আরও কিছুক্ষণ চলত। বাধা দিল নিশি। রান্নাঘর থেকে ঘুরে এসে সে দাঁড়াল তার সামনে।

'আপা, বেগুন ভাজবে না?'

খুশি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সাড়া দেয় বেশ কিছুক্ষণ পর, যখন হঠাৎ তার স্বাভাবিক চেতনা ফিরে আসে, আর মনে পড়ে, নিশি একটা প্রশ্ন করেছে তাকে।

'কিছু বলছিস, নিশি?'

নিশি খাটের ওপর বসে বোনের কাঁধে হাত দেয়। 'তোমার কী হয়েছে, আপা?'

'কই, কিছু হয়নি তো!'

'জায়গাটা তোমার ভাল লাগছে না?'

'নাহ।'

নিশি হাসল। 'তুমিই কিন্তু নানান কথা বলে আমাকে পটিয়েছ। উপন্যাস পর্যন্ত পড়তে দিয়েছ আমাকে ইমপ্রেস করার জন্যে।'

খুশি অবাক হয়ে নিশির দিকে তাকিয়ে থাকে। কত সহজে হাসতে পারে নিশি। আর হাসলে তাকে কী যে সুন্দর দেখায়! সে লক্ষ করেছে, অতি সম্প্রতি তার হাসিতে কি যেন বাড়তি শ্রী যোগ

হয়েছে। ও কি সত্যি কারুর প্রেমে পড়ল? কে সেই পুরুষ? জাফর না বশির? খুশি নিজের জীবনের মস্ত বইয়ের পাতা ওলটায়। ভুলে যাওয়া অধ্যায়গুলো একবার দ্রুত নেড়েচেড়ে দেখে। একদিন সে নিজেও নিশির মত ভুবন-ভোলানো হাসি হাসতে পারত। সে-হাসিতে বুঁদ হয়ে যাবার মত ভক্ত ছিল। মানু এখন আর বউয়ের হাসির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে না। কে জানে, হয়তো সময় পায় না। হয়তো···হয়তো···

খুশি নিজের মনের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে ভাবনা-বইয়ের মলাট মুড়ে দেয়। নিশির হাতের ওপর হাত রেখে বলে, 'তোর দুলাভাই কোথায় গিয়েছিল রে?'

নিশি বলল, 'ও! তুমি তাই ভেবে মন খারাপ করছ? কোথায় আবার যাবে? অন্ধকারে নিজের সাহস পরীক্ষা করছিল হয়তো।'

'আর তোরা সবাই? কটিজটা ফাঁকা করে সবাই চলে গিয়েছিলি?'

নিশি মুখে ওড়না চাপা দিল। 'সবাই যাব কেন? আমি বশির ভাইয়ের সঙ্গে দুলাভাইকে খুঁজতে গিয়েছিলাম। কেন, তোমাকে বলেই তো গেলাম!'

'ও, হ্যাঁ। মনে পড়েছে। আর জাফর···মোরশেদা···ওরা?'

নিশির চোখে নীরব কৌতুক ঝিলিক দিয়ে যায়। 'কি জানি!'

খুশি অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব, নিশি?'

'একশো বার।'

'জাফরকে তোর কেমন লাগে?'

'ভাল না।'

খুশি নিশির হাতে হাত বুলিয়ে বলল, 'এত তাড়াতাড়ি জবাব দিসনে। জাফর তোকে বিয়ে করতে চায়, জানিস?'

'জানি।'

খুশি তীক্ষ্ণ চোখে বোনের দিকে তাকিয়ে থাকে। 'তোর পছন্দ না হবার কোন কারণ দেখি না। ছেলে হিসেবে জাফর কি খারাপ?'

নিশি ভেবেছিল আর কথা বাড়াবে না। কিন্তু খুশির মন-মানসিকতার সঙ্গে তার পরিচয় অন্তত বিশ বছরের। জানে, শক্ত একটা উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত সে ছাড়বে না।

'ছেলে হিসেবে...বশিরও...খুব খারাপ না, আপা।'

এভাবে সরাসরি বশিরের কথাটা তুলবে নিশি, খুশি একটুও ভাবেনি। অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর সে বলল, 'ফাইনাল সিদ্ধান্ত নিয়েছিস?'

'হ্যাঁ।'

'একটা কথা তুই ভেবে দেখিসনি, নিশি।'

'কী কথা?'

খুশি বলল, 'বশিরের মনটা হয়তো ভাল। দেখতেও খারাপ না। কিন্তু নিজের পায়ে চলার ক্ষমতা নেই তার। একসঙ্গে বিজনিস করছে, কোনরকমে চলে যায়। কিন্তু যদি কখনও আলাদা কিছু করার প্রশ্ন ওঠে...'

কাট-ইন করল নিশি। 'একসঙ্গে আছে, তাই ওইরকম মনে হচ্ছে। মানুষ আসলে পরিস্থিতির দাস, আপা। ঠেকায় পড়লে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কিন্তু...জাফর...কি কিছু জানে তোর এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে?'

'জানি না।'

'তোর সঙ্গে কোন কথা হয়েছে তার? মানে···আমি বলতে চাই·· তুই কি তোর ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা তাকে বলেছিস?'

নিশি বোনের দিকে তাকিয়ে তার মনের কথাটা বুঝতে চেষ্টা করল। ঘরের অন্ধকার চোখে সয়ে এসেছে। এতদিনের চেনা বোনটাকে তার হঠাৎ অচেনা মনে হয়।

'কথা তো···কতই হয়।'

'বশিরের সঙ্গে তোর ইয়ের কথা জানে কি না।'

নিশি বলল, 'আমি ওই ব্যাপারে কিছু বলিনি।'

এবার খুশিকে খানিকটা নিশ্চিন্ত মনে হয়। 'বেশ। জাফরকে এখনই কিছু জানানোর দরকার নেই। জাফরকে অসন্তুষ্ট করলে আমাদের বিপদ হতে পারে।'

'কিন্তু, আপা, পরে জানাজানি হলে বিপদটা বেশিও হতে পারে। তার চেয়ে সময় থাকতেই তাকে মোটামুটি একটা ধারণা দেয়া ভাল না?'

'না, খবরদার!'

'কেন, আপা?'

খুশি একটু দ্বিধার পর বলল, 'প্রথম কারণ হচ্ছে···'

কারণটা বলার সুযোগ পেল না নিশি। একসঙ্গে তিনজনই হুড়মুড় করে ঢুকল ঘরে। মানু সুইচ বোর্ড হাতড়ে লাইট জ্বেলে দিল। একশো ওয়াটের তীব্র আলো অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের ওপর।

'কী ব্যাপার, ম্যাডাম? বোনের সঙ্গে কিসের শলা-পরামর্শ চলছে?'

জাফর মানুর দিকে তাকিয়ে তেরচা হাসি হাসে। 'কিসের আবার? মেয়েরা রান্না আর সেলাই ছাড়া জানে কী?'

বশির গম্ভীর স্বরে বলল, 'কথাটা ঠিক হলো না, জাফর। খালেদা জিয়া আর শেখ হাসিনাকে জিজ্ঞেস করে দেখো, ওঁরা ওই দুটো জিনিস ছাড়া আর সবই ভাল বোঝেন।'

মানু হাসতে হাসতে খাটের দিকে এগিয়ে যায়। দুই বোনের মাঝখানে বসে দু'জনের পিঠে দু'হাত চাপিয়ে দেয়। 'খালেদা ম্যাডাম আর হাসিনা আপাকে এখন পাব কোথায়? আপাতত এরাই আমাদের ম্যাডাম আর আপা। আসেন, আর এক রাউণ্ড ব্রিজ হয়ে যাক।'

নিশির ব্রিজে আগ্রহ ছিল না। কিন্তু আপাতত জাফর আর বশিরকে ঘিরে স্নায়ুযুদ্ধের হাত থেকে বাঁচার জন্য ব্রিজ মন্দ হবে না। সে লাফিয়ে উঠল।

'চলো না, আপা!'

খুশি উঠে পড়ল। 'তোমরা চারজন তো আছই। আমি বরং রান্নাঘরে যাই।'

রান্নাঘরে যাবার পথে নিশির কামরায় উঁকি দেয় খুশি। মোরশেদা অসময়ে গোসল করে কাপড় বদলাচ্ছে। খুশিকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নেয় সে। কেন যেন খুশির বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে ওঠে।

চার

সেদিন আর ব্রিজের আসর বসেনি মানুর কামরায়। মানু খুশির দোষ দিয়েছে। কিন্তু খুশির বক্তব্য আলাদা। মানু নিজেই নাকি তাস খেলার প্রোগ্র্যাম বাতিল করেছে। জাফর আর বশির মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছে। নিশিও নীরব জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকিয়েছে মোরশেদার দিকে।

মোরশেদা ভ্রূপল্লবে বিরক্তি-মাখানো ঢেউ তুলে বলেছে, কী জানি! তোমাদের ব্যাপার-স্যাপার বোঝা কি আমার কাজ?'

'আপা তোকে খাওয়ার জন্যে ডেকেছিল। গেলি না যে!'

মোরশেদার চোখে বাড়াবাড়ি রকমের বিরক্তি ছড়িয়ে পড়ে। 'দুপুরে আমি গিয়েছিলাম রান্নাঘরে, রান্নার কাজে সাহায্য করতে। আপা এমন আচরণ করল আমার সঙ্গে—'

'কেমন আচরণ?'

'আমি যেন চাঁড়াল। ডোম। ছোঁ মেরে হাত থেকে হাড়ি কেড়ে নিল।'

নিশি চুপ করে যায়। সত্যি, খুশির আচরণ অদ্ভুত লাগছে, কাল বিকেল থেকেই। মোরশেদাকে যেন সে সহ্য করতে পারছে না।

অবশ্য অদ্ভুত আচরণ খুশি একাই করছে না। দুলাভাইকেও কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। তারা যে মাঝে মাঝে দাম্পত্য কলহে মাতে না— এমন নয়। কিন্তু সে আলাদা ধরনের ঝগড়া। খুশি বেশি কথা বলে না, কিন্তু যেটুকু বলে, তাই মানুর কাছে বিছুটি পাতার ঘসার মত লাগে। তিড়বিড় করে চেঁচিয়ে ওঠে সে। তার জ্বলুনির ধাক্কা সামলায় গ্লাস-কাপ-পিরিচ। দমাদম ভাঙচুর চলতে থাকে আধঘণ্টা ধরে। দু'চারদিন কথা বন্ধ থাকে। কিন্তু বেশিদিন ওই আড়ি চালিয়ে যাবার সাধ্য তাদের কারুরই নেই। খুশি শুধু মানুর স্ত্রী নয়, বিজনিসের পার্টনারও। গুরুত্বপূর্ণ পার্টনার। কোন কোন ব্যবসা শুধু খুশির নামেই চালানো হয়। সেসব ব্যবসার কাজে খুশি সক্রিয় অংশ নেয়। তার পরামর্শ, স্বাক্ষর এমনকি মীটিং-এ অংশগ্রহণও অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। এইসব কারণে শেষ পর্যন্ত ঝগড়া টেকে না।

কিন্তু আউটিং-এ এসে সেরকম ঝগড়া-বিবাদের প্রশ্নই ওঠে না। নিশি লক্ষ করে, ন্যাশনাল পার্কে এসে পৌঁছনোর পরেও খুশির চোখেমুখে যে দ্যুতি ছিল, তা কখন যেন হারিয়ে গেছে। আবছা অন্ধকার খেলা করছে সেখানে। তার সঙ্গে বশিরের গোপন সমঝোতা নিয়ে একটা চাপা অসন্তোষ ছিল খুশির মনে। কিন্তু নিশি জানে, এই মুহূর্তে কোন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার সামর্থ্য নেই তার। মানুও তাকে ভালভাবেই সাবধান করে দিয়েছে। জাফরকে সরাসরি প্রত্যাখান করা কিংবা বশিরের ব্যাপারে সোজাসুজি কোন ঘোষণার ধারে-কাছে যায়নি নিশি। তা হলে সমস্যাটা কোথায়?

মানু বেরিয়েছে কি একটা ফার্ম দেখতে। সেখানে নাকি মাগুর আর শোল মাছের চাষ হয়। বেশ কিছুদিন ধরেই সে পার্টনারদের কনভিন্স করার চেষ্টা করছিল। মাছ চাষ ভাল জিনিস। খুবই

লাভজনক। পার্টনাররা প্রথমদিকে হাসাহাসি করলেও শেষ পর্যন্ত বেশ সিরিয়াস হয়ে ওঠে, মৎস্য অধিদপ্তরে যাওয়া-আসাও শুরু করে। কিন্তু সে-গুড়ে বালি দিয়েছে খুশি। মাছ? ঠিকাদারি থেকে শুরু করে শেষ হবে জেলের পেশায়? বশির একবার মৃদু তর্ক করার উদ্যোগ নিয়েছিল। তা হলে গার্মেন্টস শিল্প গড়ে যারা শিল্পপতির দলে নাম লিখিয়েছে তারা সব দরজি?

কিন্তু খুশি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, যত যুক্তিই থাক, মাছের কারবার করা যাবে না। মানু অনেকদিন আর এ-নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি। হঠাৎ আজ তার মাগুর মাছের খামারে আগ্রহ খুশিকে চিন্তায় ফেলেছে। নিশি নিজেও বেশ চিন্তিত।

বশির এসে তার ভাবনার সূক্ষ্ম জালগুলো ছিঁড়ে দেয়। 'নিশি, বেড়াতে যাবে?'

নিশির বুকের ভিতর বুনো ঝড় ওঠে। 'কোথায়?'

'চলোই না!'

নিশি বোনের অনুমতি ছাড়া কোথাও যাবার কথা ভাবতে পারে না। 'যাব, আপা?'

খুশি বোনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। নিশি জানে, সে কি বলতে চায়। 'ভেবো না, আপা। বেশি দেরি করব না।'

'দূরে যেয়ো না।'

'না, না। এই তো, ওদিকের দিঘিটা দেখেই ফিরে আসব।'

দ্রুত কাপড় বদলে নেয় নিশি। মুখে আলতো করে ক্রিম বোলায়। চুলে ক্ষিপ্র হাতে চালিয়ে দেয় চিরুনি। হঠাৎ একটা টিপ বসিয়ে দেয় কপালে। আয়নার ভিতর সকৌতুকে তার দিকে তাকিয়ে আছে নিশি। অন্য এক নিশি। অন্য নারী।

'সাবধান থেকো। নিজেকে ছাড়িয়ে যেয়ো না।'

'আমাকে বোকা ভেবো না!'

'তুমি খুব বেশি চালাক নও।'

'কিন্তু নিজেকে সামলাতে জানি। খামোকা ভয় দেখিয়ো না।'

প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে জিভ ভেঙচে দেয় নিশি। হালকা লাগছে নিজেকে। উড়ু উড়ু।

বাঙলো বাড়ির সীমানা পেরিয়ে নিশি পেছন ফিরে তাকায়। দেখা যাচ্ছে না কাঠের বাঙলো। শুধু ওভারহেড ট্যাঙ্ক চোখে পড়ে। তবু তার মনে হয়, খুশি পেছন দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে। চোখে উপচে-পড়া উদ্বেগ। সবাইকে নিয়ে কিসের এত টেনশন তার? কেন এমন হারানোর ভয়? খুশি বদলে যাচ্ছে, নিশির মন হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়।

বশির নিশির কাঁধে হাত রাখল। 'এভাবে পেছন ফিরে তাকাতে নেই, নিশি।'

নিশি হাসতে চেষ্টা করে। 'কেন?'

'হোঁচট খেয়ে পড়বে।'

নিশি বশিরের মুখের দিকে তাকায়। 'তুমি যে পাশে আছ!'

'আমি একা নই, তোমার পাশে আরও অনেকে আছে। কিন্তু পথ সবসময় পথিকের একারই। সামনের দিকে তাকিয়ে সবল পায়ে হাঁটতে না পারলে দেখবে একসময় মুখ থুবড়ে পড়ে গেছ।'

নিশি থমকে দাঁড়াল। ভেবেছিল, আপন মনে কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাবে বশির। তারপর একটু গিয়েই থামতে হবে তাকে। পেছন ফিরে তাকাতে হবে। আর নিশি সকৌতুক হাসির সঙ্গে বলবে, 'কী, মশায়? পেছন ফিরে তাকাতে নেই?'

কিন্তু সেসব কিছুই হলো না। বশির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'কী হলো?'

'পরীক্ষা করলাম তোমাকে।'

বশির হাসল। 'কী পরীক্ষা?'

'বলব না।'

'বেশ। পাস করেছি কি না তাও বলবে না?'

নিশি বলল, 'তুমি পাস করেছ। কিন্তু আমি তো ফেল!'

মাথা ঝাঁকায় বশির। 'খুব কঠিন কথা। মাথায় ঢুকছে না।'

'আচ্ছা, বশির, ধরো একসঙ্গে চলতে চলতে যদি কোনো কারণে আমি পিছিয়ে পড়ি, তুমি পেছন ফিরে তাকাবে না?'

'এই কথা! আমি আসলে সেই সেন্সে কথাটা বলিনি, নিশি। আমি তো তোমার পাশে পাশেই চলতে চাই। সারাজীবন।

মৃদু হিমেল বাতাসে শাল-মহুয়ার পাতা যেমন কেঁপে ওঠে তেমন করে কেঁপে উঠল নিশি। দু'হাতে বশিরের কাঁধ আঁকড়ে ধরে সেখানে মাথার ভার ছেড়ে দিল। বশির গাল বাড়িয়ে নিশির চুলের স্পর্শ পায়। এক ধরনের অপার্থিব গন্ধ। তার মনে হয়, নিশির শরীরের এই মায়াবী গন্ধ অন্য কারুর নেই, অন্য কোথাও নেই।

ধরা গলায় বশির বলল, 'আমি দুঃখ পেতে রাজি, কিন্তু অনুশোচনার মধ্যে নেই। আমি যা করি, প্রাণের সাড়া নিয়েই। তারপর যা-ই ঘটুক পরিণামে, তার মুখোমুখি হতে ভয় পাই না।'

'জানি। তুমি খুব সাহসী। বীরপুরুষ।'

'তোমার কথায় ঠাট্টার সুর পাচ্ছি।'

হেসে ফেলে নিশি। নির্জন শালবনে তার হাসির শব্দে একঝাঁক পাখি গান থামায়। বশির বুঝতে পারে সে একটু একটু কাঁপছে। তার

চোখের তারায় অনেক কথা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু সে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করে, একটি কথাও মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে না। নিশির কথায়, হাসির শব্দে সম্ভবত কুহকীর ক্ষমতা লুকিয়ে আছে। বশিরকে সে মন্ত্রমুগ্ধ করে দেয়; অবশ করে দেয়।

নিশি তার মুখে কনিষ্ঠার ছোঁয়া বুলিয়ে বলল, 'ঠাট্টার সুরে অনেক সত্যি কথা সহজে বলা যায়। বুঝেছ মশায়? গম্ভীর হয়ে সব কথা বলা যায় না।'

অভিভূত দৃষ্টিতে নিশির দিকে তাকিয়ে থাকে। 'আমাকে সাহসী বলছ। বীরপুরুষ বলছ। একদম বাজে কথা। আমার সাহস নেই। বরং কাপুরুষ বলতে পারো আমাকে। আমি আসলে কাপুরুষের চেয়েও অপমানজনক জীবন যাপন করি।'

দিঘির পাশ দিয়ে যাবার সময় বশিরের হাত ধরে টান দেয় নিশি। 'এখানে একটু বসবে, বশির?'

বশির বসল। তার দু'চোখে ম্লান ছায়া। 'তুমি ভালবাসো, তাই মনের মন্দিরে আমাকে বীর বানিয়েছ। আমি তোমার মনে দুঃখ দিতে চাই না, নিশি। কিন্তু যা সত্যি তা তো কেউ স্বীকার না করলেও সত্যি।'

নির্জনতায় খাঁ খাঁ করছে চারদিক। দিঘিটাও নিঃসঙ্গ দিন কাটিয়ে ক্লান্ত বিকেলে কারুর সঙ্গ লাভের লোভে তিরতির করে কাঁপছে একবুক পদ্ম নিয়ে। নিশি একটুকরো মাটি ছুঁড়ে দেয় দিঘির পানিতে। চমৎকার তরঙ্গ তৈরি হয়। হেসে ওঠে লাল পদ্ম।

নিশি বশিরের চোখে চোখ রাখে। তার স্বচ্ছ চোখের মণিতে পদ্মের নাচ দেখতে পায় নিশি। 'তুমি যেমন তোমার জীবন আর যুদ্ধের একটা পিঠ দেখতে পাও, আমি তেমন অন্য একটা পিঠ

দেখি।'

'মিথ্যে স্তোক দিয়ে কী লাভ, বলো? তুমি তো জানো না, আমি এই ফার্মের একজন ডিরেক্টর। দু'আনা অংশের মালিক। কিন্তু...'

বশিরের মুখে হাত চাপা দিল নিশি। 'আমি হয়তো সবটা জানি না, জানতে চাইও না। কিন্তু একেবারে জানি না ভেবো না।'

বশির হাসতে চেষ্টা করল। 'কী জানো তুমি?'

ব্যবসা, শিল্প...এসব জটিল জিনিস। সরলরেখায় কিছু চলে না যেখানেই গোঁজামিল আছে, টুকটাক চুরি-চামারি আছে।'

বাধা দিল বশির। 'কিন্তু দেখো, ওদের সব সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিই। প্রতিবাদ করি বড় দুর্বল স্বরে। আমার সাহস হয় না। কেন জানো? আমার পুঁজি কম। ঝামেলার লাইন-ঘাট জানা নেই। ইনকাম ট্যাক্সের বোঝা চেপেছিল দৈত্যের মত। একমাস ধরে ঘোরাঘুরি করেছি কমিশনারের অফিস আর উকিলের চেম্বারে। সুবিধে করতে পারছিলাম না। সরকারি অফিসার যত কড়া কথা বলে তার চেয়ে বেশি ভয় দেখায় আমাদের ঠিক করা উকিল। শেষপর্যন্ত জাফরই সব সামলে নিল। সোয়া লাখ টাকার মামলা। সে সব ম্যানেজ করল ত্রিশ হাজার টাকায়। দেখো, আমি সব জানি। কিন্তু কোন প্রতিবাদ করতে পারলাম? নিশি, তুমি ভালমানুষ। সব গোপন কথা বলে তোমার মন খারাপ করে দিতে চাই না। কিন্তু...সমস্যা কী, জানো?'

নিশি তাড়াতাড়ি বলল, 'জানতে ইচ্ছে করে না।

'কিন্তু তোমার জানা দরকার। নিজের ইচ্ছেয় তুমি আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়েছ। আমি কোন ফাঁদ পাতিনি, লোভ দেখাইনি।'

'কোন বীরই তা করে না।'

'তবু তুমি আমাকে উপহাস করবে?'

নিশি নখ দিয়ে বশিরের পিঠে 'ভালবাসি' শব্দটি লিখতে লাগল বারবার। ধরা গলায় বলল, 'উপহাস করিনি। তুমি সত্যি আমার পুরুষ। তুমি তোমার বীরত্বের খবর জানো না। আমি জানি।'

বশির হাল-ছেড়ে দেয় না। 'আমরা এমন সব কাজ করতে বাধ্য হই, যার পেছনে বিবেকের কোন সায় থাকে না, থাকতে নেই। সবটা আমি পারি না, বুঝি না, কিন্তু কই, সাহস করে তো বলতেও পারছি না—আমি এসবের মধ্যে নেই। কোন অন্যায়ই তো অস্বীকার করতে পারছি না। কোন অপরাধই এড়িয়ে যেতে পারছি না।'

'নিশ্চয় একদিন পারবে। আমি জানি, তুমি পারবে।'

বশির হেসে ফেলে। 'কী যে বলো!'

'শোনো, তোমার সাহসের কোন অভাব নেই। তুমি হিসেবী আর ধীর-স্থির, এই যা। চট করে তোমার মাথা গরম হয় না। কিন্তু সব অন্যায়ের ব্যাপারে তোমার প্রতিবাদ আমি টের পাই। আমাকে তুমি ফাঁকি দিতে পারো না। তুমি যে···আমার বীর! আমার পুরুষ!'

বশিরের কাঁধে মাথা রাখে নিশি। বশিরের হঠাৎ মনে হয়, সে এতদিন নিজেকে চিনতে পারেনি। বুঝতে পারেনি। সে বীর। সে সাহসী। নিশি যে মিথ্যে কল্পনা করেনি, একদিন সে প্রমাণ করবে। শিগগিরই। সময়ের অপেক্ষায় থাকবে সে। নিশির মাথা থেকে পালিয়ে-আসা চুল তার মুখে আদরের শয্যা পাতে। শালবনে সন্ধের হাতছানি দেখেও তার আর উঠতে ইচ্ছে হয় না।

'নিশি, একটা কথা।'

'বলো!'

'যদি আর অ্যাডজাস্ট করতে না পারি, যদি তোমার বোন-দুলাভাইয়ের সঙ্গে ব্যবসায়িক কারণে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়, তুমি কীভাবে নেবে ব্যাপারটা?'

নিশি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। 'খুব শিগগিরই এমন কিছু ঘটার সম্ভাবনা আছে নাকি?'

'যা ঘটার, তা তো যে-কোন সময়েই ঘটতে পারে। আমি শুধু তোমার মনের কথাটাই জানতে চাই।'

নিশি বশিরের চোখে চোখ রেখে লাল পদ্মপাতার দোলা দেখল। 'তুমি তো জানো আমি তোমাকে ছাড়া কাউকে বুঝি না, কিছু বুঝি না।'

'এই মুহূর্তে আমার পক্ষে বোকামি হবে পার্টনারদের অস্বীকার করে চলে যাওয়া। তা ছাড়া···যতদূর মনে হয়··· তোমারও ঠিক প্রস্তুতি নেই।'

নিশি বলল, 'তার দরকারই বা কী? এই ফার্ম ভেঙে আজই তুমি আলাদা হতে পারো, কোন বাধা নেই। কিন্তু যতদিন পুরোপুরি নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারছ, অন্য কোন গ্রুপে ঢুকতেই হবে তোমাকে। তারা জাফর সাহেব কিংবা দুলাভাইয়ের চেয়ে খারাপ হবে না— এমন গ্যারান্টি কোথায়?'

বশিরের চোখে মুগ্ধতা ছড়িয়ে পড়ে। 'তুমি সত্যি বুদ্ধিমতী। তোমার বিবেচনা ক্ষমতার ওপর আস্থা বেড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে···মনে হচ্ছে···'

মাঝপথে থেমে যায় বশির।

'কী মনে হচ্ছে, বীর?'

'তোমাকে সঙ্গিনী হিসেবে পেলে আমি একাই জীবন যুদ্ধে

জিততে পারব। অন্য কোন দলে না ভিড়েও আমরা দাঁড়িয়ে যেতে পারব। কোন অন্যায়ের সঙ্গে আপস করার দরকার হবে না। শুধু যদি তুমি পাশে থাকো, অভয় দাও...'

জোনাকিদের আনন্দময় আলোর মিছিল ঘিরে ধরে ওদের। সে-উল্লাসে বশিরের কথা থেমে যায়। নিশি তার হাতে হাত রাখে। উঠে দাঁড়ায় তারা।

বাঙলোয় ফেরার পথে বশির তাকে শোনায় ছোট ছোট পেশার পেছনে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা অপরাধের কথা।

নিশি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'এত পেয়েও মানুষের শখ মেটে না? তার আরও চাই?'

'উপায় নেই, নিশি। মানুষের একটা চাওয়া অন্য একটা চাওয়ার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে যে কামনার বিরাট এক ট্রেন শেষ পর্যন্ত তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। একটা চাওয়া পূরণ হতে না হতেই অন্য এক আকাঙ্ক্ষা এসে উপস্থিত হয়।'

নিশির শরীরের একাংশ লেপ্টে যায় বশিরের শরীরের সঙ্গে। তবু পথ চলা থামে না। বশিরের কানের কাছে মুখ রেখে সে বলে, 'তোমারও আকাঙ্ক্ষা আছে। কিন্তু আমি জানি, সে তোমাকে ওভাবে জালে জড়াতে পারে না। তুমি দিব্যি সব প্রলোভনের মায়া কাটাতে পারো। তাই তুমি বীর।'

ওভারহেড ট্যাঙ্কের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় বশির। ট্যাঙ্কের ওপর একজোড়া মানুষের ছায়া-ছায়া মূর্তি খেলা করে গাঢ় নীল আকাশের প্রেক্ষাপটে। বশির নিশির কটিতে আলতো করে হাত রেখে হাঁটছিল। থমকে দাঁড়িয়ে নিশির কোমরে শক্ত বাঁধন তৈরি করে সেই হাত। নিশিও থামে। থেমে যায় তাদের পায়ের নিচে

শুকনো পাতার মর্মর।

'নিঃশ্বাসের শব্দে নিশি জিজ্ঞেস করে, 'ওখানে কারা?'

তার ঠোঁটের ওপর লম্বভাবে আঙুল রাখে বশির। আরও নিচু শব্দে বলে, 'চুপ! ভয় পাবার কিছু নেই। খুব সম্ভব জাফর আর মোরশেদা।'

নিশি নীরব হাসি দিয়ে বলে, 'মন্দ কী?'

ওভারহেড ট্যাঙ্কের যুগল ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে আলাদা হয়ে যায়। তারা কি নিশি আর বশিরকে দেখতে পেয়েছে? নিশির হাত ধরে টান দেয় বশির। গেটের কাছে পৌঁছে আবার চমকে থেমে যায় ওরা। টর্চের আলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে ওদের মুখে।

অন্ধকারে মানুর চাপা গলা শোনা যায়। বিষম বিরক্ত। 'তোমরা এখানে কেন? যাও, বাঙলোয় যাও।'

নিশি নিচু স্বরে বলল, 'দুলাভাই, আপনি!'

'শ্‌শ্‌...যাও, তাড়াতাড়ি কেটে পড়ো।'

নিশি অসহায়ভাবে বশিরের মুখের দিকে তাকায়। বশির তার হাত ধরে টান দেয় আবার। দু'সেকেণ্ডের মধ্যেই অন্ধকারে হারিয়ে যায় তাদের দেহরেখা।

ওভারহেড ট্যাঙ্কের ওপর তখন উঠে দাঁড়িয়েছে মোরশেদা আর জাফর। মিটিমিটি হাসছে মোরশেদা। 'কেমন বিশ্রী কাণ্ড হয়ে গেল, বলেন তো?'

জাফর বলল, 'বিশ্রী আবার কী? এম. ডি. সাহেব আমাদের ধরতে এসেছিল। ধরা পড়ল তার বেচারা শালী আর ওই মিনমিনে ভিতুর ডিম, বশির।'

'তবু সাবধানের মার নেই। চলেন, বাঙলোয় ফিরে যাই।'

'তুমি আগে যাও, আমি পেছনে।'

আদুরে গলায় মোরশেদা বলল, 'উঁহুঁ, আগে আপনি যাবেন। আমি ফলো করব।'

জাফর আপত্তি করল না। সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল তরতর করে। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল পলকের ভিতর। মোরশেদা বুঝতে পারে, তার ভয় লাগছে। নিচে, মাটিতে জোনাকির মেলা বসেছে। জোনাকি দেখলেই তার কবরের কথা মনে হয়। মানুর হাতে ধরা পড়ার ভয়ে জাফরকে ছেড়ে দেওয়া ভুল হয়েছে।

কাঁপা-কাঁপা পায়ে নিচে নামল মোরশেদা। শেষ সিঁড়িতে পা রেখেছে, এমন সময় মানুর গম্ভীর গলা শুনে সে পাথরের মত স্থির হয়ে গেল। 'দাঁড়াও, মোরশেদা। কথা আছে।'

পাঁচ

মোরশেদাকে অনেকদিন ধরে সাধা হচ্ছিল কোয়াড করপোরেশনে জয়েন করার জন্য। বেশি কাজ নেই। ওকে শুধু অফিস সামলাতে হবে। অফিস মানে তিন কামরার একটা বাড়ি, তিনটে সেক্রেটারিয়েট টেবল আর একটা কনফারেন্স টেবল, দুটো টেলিফোন, গোটাকতক ফাইল ক্যাবিনেট। নানান কাজে, মানে,

সত্যি বলতে গেলে, নানান ধান্দায় দিনের বেশির ভাগ সময় বাইরেই কাটাতে হয় মানু, জাফর আর বশিরকে। খুশি প্রথমদিকে নিয়মিত অফিসে বসেছে। কিন্তু কবে কার কথায় যেন বিষম বিগড়ে যায় সে। সবাই খুব ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল কারণ জানতে। কিন্তু খুশি কাউকে কিছু বলেনি। মানুকে কোন দুর্বল মুহূর্তে কিছু বলেছিল হয়তো, মানু চেপে গেছে ব্যাপারটা। অন্য কারুর কাছে মুখ খোলেনি এই ব্যাপারে, কিন্তু অফিস ম্যানেজারের ঝক্কি সামলানোর জন্য আর পীড়াপীড়িও করেনি।

এরপর একটি মেয়ে কিছুদিনের জন্য চাকরি নিয়েছে কোয়াড করপোরেশনে। হাসি-হাসি মুখ, একটু বেশি সপ্রতিভ ধরনের। তার বাতিক ছিল কথায় সবাইকে হারিয়ে দেবার চেষ্টা করা। চেষ্টাটা মাঝে মাঝে খুব অস্বস্তিকর হয়ে উঠত। কিন্তু সবাই মেনে নিয়েছে মেয়েটিকে— অন্তত চেষ্টা করেছে। সেই মেয়ে হুট করে একদিন বিয়ে করে ফেলল এক বড়লোকের ছেলেকে। ব্যাগ দুলিয়ে সবাইকে নিমন্ত্রণ করল রিসেপশন পার্টিতে; কিন্তু চাকরি করল না আর।

মানু কয়েকদিন ধরেই বলছিল, মোরশেদা মেয়েটি বেশ। অফিসটা যদি সামলাতে পারে, মন্দ হয় না। জাফর বলেছে, 'কেন, বস্? আপনার শ্যালিকাটি মন্দ কিসে?'

প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকিয়েছে মানু। 'উঁহুঁ। ওই চেষ্টা অনেক করেছি। লাভ হয়নি। শ্যালিকা আমার ফার্মে কাজ করবে না। বড় বোন প্রথম দিকে ওকে রাজি করাতে চেষ্টা করেছিল। ছোট বোনের কালো মুখ দেখে চেষ্টা বাদ দিয়েছে। কী দরকার শুধু শুধু পারিবারিক সমস্যা তৈরি করে?'

এর পর আর কথা চলে না। কিন্তু সেদিন দুপুরে বাঙলো বাড়ির ডাইনিং টেবিলে নাটকীয়ভাবে ঘোষণা করেছে মানু, কোয়াড করপোরেশনে এক নতুন কর্মচারী যোগ দিচ্ছে, দু'একদিনের মধ্যেই।

ব্যাখ্যা দরকার হয়নি, পরিচিতির তো প্রশ্নই ওঠে না। মোরশেদার মুখের দিকে তাকিয়ে সবাই বুঝে নিতে পেরেছে, কে সেই নতুন কর্মচারী। জাফর মনে মনে রীতিমত উল্লসিত। এবার সে মাঝে মাঝে তার অফিস ডেস্ক ব্যবহার করার একটা উৎসাহ পাবে। মোরশেদার জীবনে খুব অল্প সময়ের মধ্যে দুটো নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে, তার অজানা নয়। একটি নাটকের নায়ক সে নিজে। অন্যটির নায়ক— নায়ক না বলে ভিলেন বলাই ভাল— আমিনুল ইসলাম মানু। মানু ম্যানিজিং ডিরেকটরই শুধু নয়, রীতিমত ম্যানিজিং ম্যান। জাফর সব জানে, বোঝে। তবে মুখ খোলার ব্যাপারে সে সতর্ক থাকবে। মানুর যেমন জাফরকে দরকার, তেমনি মানু ছাড়া জাফরেরও চলবে না। তা ছাড়া মানু ওই মেয়েটিকে বেকায়দায় ফেলে ব্ল্যাকমেইল করছে— এটা যেমন সত্যি, তেমনি মোরশেদার দুর্বলতা মিথ্যে নয়। তার দুর্বলতা আবার একজনের প্রতি নয়। তিন তিনটে দুর্বল পয়েন্ট আছে তার। এস. পি. সাহেবের ছেলে, জাফর হাসান এবং শেষ পর্যন্ত আমিনুল ইসলাম মানু। এতগুলো শখের দায় যার, তার কাছ থেকে সুযোগ সন্ধানী শৌখিন মানুষেরা কিছু বাড়তি আদায় করবেই।

বশির এক রকমের সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে লাগল। মোরশেদা কোয়াড করপোরেশনের চাকরিতে যোগ দিচ্ছে— এতে তার আনন্দিত হওয়া উচিত। কোয়াড করপোরেশনের রিসেপশনিস্ট,

সেক্রেটারি কিংবা অফিস ম্যানেজার— যা-ই হোক—মেয়েটিকে বেশির ভাগ সময় ব্যস্ত থাকতে হবে জাফরের সঙ্গেই। ওদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই নিশি জাফরের আশু দাবির হাত থেকে খানিকটা হলেও মুক্তি পাবে। দুর্ভাবনা কমবে বশিরের। কিন্তু চিন্তাটা খুব বেশি স্বার্থপরের মত হয়ে যাচ্ছে না? আরও একটা ব্যাপার আছে। খুশি যে সংবাদটা শুনে একটুও খুশি হয়নি— তার মুখেই ওইরকম লক্ষণ ছাপ ফেলেছে। কিন্তু খুশির অসুবিধে কোনখানে, বশির ভেবে পেল না। জাফর তার কাজ আদায়ের জন্য যত দু'নম্বর রাস্তা ধরে তার প্রায় সব মোড়েই থাকে খুশির সবুজ সঙ্কেত। মোরশেদাকে কিছু কিছু হাঁটানো হবে ওই পথে, সন্দেহ নেই। তাতে কোয়াড করপোরেশনেরই লাভ। খুশি অখুশি কেন তবে? মানুকে অবিশ্বাস করছে? স্রেফ বাকামি। মানু অবিশ্বাসের কাজ করতে চাইলে মোরশেদার দিকে হাত বাড়াতে চাইবে কেন? তা ছাড়া মোরশেদা এদের ফার্মে যোগ দেয়ার মানেই হচ্ছে সে খুশির নজরের আওতায় চলে এল। কিন্তু সেসব ভেবে মাথা ঘামিয়ে বশিরের সত্যি কিছু লাভ নেই। তার উচিত মুখে বিশেষ কোন মনোভাব প্রকাশ না করে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা। ব্যাপারটা খুবই নিচু মানের আত্মপরায়ণতা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। নিশি তার দিকে তাকিয়ে আছে অসহায় দৃষ্টিতে। এই পরিবেশ, এই সমাজ নিশির নয়। ওর নিজেরও নয়। নিশির হাত ধরে সরে যাবে সে। অন্য কোথাও চলে যাবে। কিন্তু তার জন্য সময় চাই।

খাওয়াদাওয়ার শেষে মাস্টার বেড-এর পাশে ছোট কামরায় মুখোমুখি হয় নিশি আর মোরশেদা। জাফর একবার ইঙ্গিতে ডেকেছে মোরশেদাকে। সে সাড়া দেয়নি। বশির নিশিকে ডেকে

পাঠিয়েছে বেবির মা-র মারফত। নিশির মন ছটফট করছিল। কিন্তু সে মোরশেদার সঙ্গে কয়েকটা দরকারি কথা সেরে নিতে চায়।

মোরশেদা হাসিমুখে তাকাল নিশির দিকে। কিন্তু তার গাম্ভীর্য সে-হাসিতে চাপা পড়ল না। শুধু গাম্ভীর্য না, আরও কি যেন ফুটে ওঠে তার মুখে, নিশি ঠিক ধরতে পারছে না। খানিকটা তাচ্ছিল্য? দেখিয়ে-দেওয়া ভাবও আছে নাকি?

'আমি জানি তুই কী বলবি।'

নিশি কিছু বলল না, বান্ধবীর দিকে তাকিয়ে থাকল। মোরশেদাকে অনেক বয়স্কা আর সুখী-সুখী মনে হচ্ছে।

মোরশেদা বলল, 'আমি কোয়াড করপোরেশনে যোগ দিতে চাই। তুই ব্যাপারটা পছন্দ করিসনি। তুই বলবি, জয়েন করার আগে আমি যেন আবার ভেবে দেখি।'

নিশির মন খারাপ হয়ে গেল। মোরশেদার অনেক দোষ আছে। ওর চরিত্র খুব স্ববিরোধী এবং অসম্পূর্ণ; খাপছাড়া বললেও চলে। তার পরও নিশি তাকে পছন্দ করে এবং সত্যি বলতে কি, অনেক বিষয়ে তার ওপর নির্ভরও করে। কিন্তু মোরশেদা খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এমন কোন জীবন ওকে মায়ার বাঁধনে বেঁধেছে, এমন কোন জগৎ ওকে অলঙ্ঘনীয় টানে টেনেছে যে পুরানো জীবন-জগৎ তুচ্ছ হয়ে উঠেছে।

নিশি বলল, 'তুই কোথায় চাকরি করবি, একবার ভাববি না দশবার ভাববি, সে তো তোর ব্যাপার! আমি কেন মাতব্বরি ফলাতে যাব?'

মোরশেদা একটু ঘাবড়ে গেল। 'তবে তুই যে চাস না—'

কাট-ইন করল নিশি। 'কিসে তোর এমন মনে হলো তুই-ই

জানিস। আমি সে সব কিছুই তোকে বলতে চাই না। আমার অন্য কথা আছে।'

'আচ্ছা, বল।'

নিশি একটু ভাবল। 'জাফর ভাইয়ের সঙ্গে তোর ঘনিষ্ঠতা কিন্তু সবার চোখে পড়ছে। কথাটা যদি লণ্ডনের চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট সাহেবের কানে যায়, তোর বিয়ের সম্পর্কটা ভেঙে যেতে পারে।'

মোরশেদা তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'জাফর সাহেবের প্রতিও তোর দুর্বলতা আছে, তা তো জানতাম না।'

'কী সব আবোলতাবোল বলছিস?'

হাসল মোরশেদা। 'দুর্বল জায়গায় ঘা দিতে পেরেছি তা হলে! শোন নিশি, কথা যখন তুললি, তখন খোলামেলা আলাপ হওয়াই ভাল। তুই একদিকে বশিরের সঙ্গে জমিয়ে প্রেম করছিস। আবার জাফর সাহেবকে হাতে রাখা দরকার। তাই আমাকে ভয় দেখিয়ে জাফর সাহেবের কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চাস। এই তো?'

নিশি স্তম্ভিত হয়ে যায়। ওর গলার স্বর চড়তে থাকে। 'দেখ, মোরশেদা, এবার তুই সত্যি বাড়াবাড়ি করছিস।'

'বাড়াবাড়ির কী দেখলি?'

'বশিরকে···আমি···ভালবাসি। সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। জাফর সাহেবের ব্যাপারে আমার কোন দুর্বলতা নেই। হাতে রাখতে চাওয়ার প্রশ্নই অবান্তর। কিন্তু এটা তোর অজানা নয় যে বাসার সবাই আমাকে জাফর সাহেবের সঙ্গে বিয়ে দিতে চান। আমি আমার মনের কথাটা জানিয়ে দিয়েছি।'

'জাফর সাহেবকেও জানিয়েছিস?

সহজ, সাধারণ প্রশ্ন। প্রশ্নকর্ত্রীর মুখে হাসি আর সারল্যের অভাব নেই। কিন্তু শুধু তারা দু'জনই জানে, এই প্রশ্নের মধ্যে কতখানি বিষ মিশে আছে। নিশি খুব কষ্টে অপমান হজম করল।

'জাফর সাহেবকে জানিয়েছি যে তাঁকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু কাকে আমার ভাল লাগে, কাকে বিয়ে করতে চাই, সে-প্রশ্ন উনি কখনও তোলেননি। তোলাটা বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তবে যদি তিনি কখনও...'

বাধা দেয় মোরশেদা। 'আমিও ওই সুযোগটা নিচ্ছি, নিশি। লণ্ডন প্রবাসী চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, এ তো সবাই জানে। জানার পরও যদি কেউ আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চায়, বন্ধুত্ব চায়, সেটা আমাদের প্রাইভেট ব্যাপার।'

'কিন্তু একটা কথা, মোরশেদা।'

'বল।'

'তোদের প্রাইভেট ব্যাপার যদি আমার বোন কিংবা তার ফ্যামিলির জন্যে সমস্যা সৃষ্টি করে, সেটা তোর-আমার দু'জনের জন্যেই খুব দুঃখের ব্যাপার হবে।'

মোরশেদার মুখ কঠিন দেখাল। সে একটা রূঢ় উত্তর দেবার জন্য মুখ খুলেছে, এমন সময় ঘরে ঢুকল বেবির মা। 'নিশি আপা, বশির ভাই আপনারে ডাকতে আছে।'

মার্চ মাসের শেষ সপ্তা। মহানগরী, এমনকি আশেপাশের উপনগরী-গুলোতেও স্বাধীনতা দিবসের রেশ চলছে। মানু জামিল সাহেবের ফার্ম দেখতে গেছে। কখন ফিরবে— ঠিক করে বলে যায়নি। তবে খুব সম্ভব রাত দশটা-এগারোটার আগে নয়। জাফর খুশির সঙ্গে

দাবা খেলছে। মোরশেদা তাদের কাছে বসে আছে একটা সিনেমা পত্রিকা হাতে নিয়ে। তবে পত্রিকার পাতায় তার বিশেষ আগ্রহ আছে মনে হয় না।

এই সময় সন্ধেটা ভারি রমণীয় হয়ে ওঠে। বাতাস চারদিকের আধা শুকনো বনে পুরো বাউলের গান তোলে। বশির হাঁটতে থাকে, তার পাশেপাশে পা বাড়ায় নিশি। বশিরকে অন্যদিনের চেয়ে গম্ভীর মনে হয়। নিশির মনটাও ভার ভার।

'কাল আমরা চলে যাচ্ছি, জানো তো?'

বশিরের প্রশ্নটা বিবৃতির মত শোনাল। নিশি ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল। দু'একদিনের মধ্যে তাদের চলে যাবার কথা। কিন্তু ঠিক কালই যাওয়া হবে, এমন সিদ্ধান্তের কথা নিশি জানে না।

'কিছু বলছ না যে, নিশি!'

'আমার মন ভাল নেই।'

বশির হাসল। নিশির কাঁধে হাত রাখে বশির। নিশি সেই হাত, হাতের সবগুলো আঙুল, এমনকি ত্বকের আড়ালে রক্তের চাঞ্চল্যটুকু পর্যন্ত অনুভব করে। এতদিনে বশিরের স্পর্শের পুরো অধ্যায় তার মুখস্থ হয়ে গেছে। বশির পরীক্ষা নিয়ে দেখতে পারে; নিশি নিশ্চিন্তে লেটার মার্কস্ নিয়ে পাস করবে।

'নিশি, কী হয়েছে তোমার? আমাকে সব খুলে বলতে পারো না?'

নিশি একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসল। 'বলার মত তেমন কিছু নেই। কী বলব?'

'তেমন কিছু নেই, মানলাম। কিন্তু যেমন আছে, তেমনই না

হয় বলো।'

নিশি বশিরের গাল টিপে লাল করে দিল। তারপর মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেই লাল হয়ে উঠল। বশির নিপীড়িত জায়গাটায় নিশির সেবা আদায় করে নেয়।

নিশি ধীরে ধীরে মুখ সরিয়ে নেয় বশিরের মুখের ওপর থেকে। 'বশির, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আমাদের এইসব কথা, এই মেলামেশা, সব স্বপ্ন। দু'দিন পর সব ভেঙে যাবে। আমি তোমাকে পাব না। তুমি চলে যাবে।'

বশির হাসল। 'এমন স্বপ্নই বা জীবনে কটা দেখেছি? স্বপ্ন হলেও এই মুহূর্তটা আমার পরম পাওয়া।'

'ভাবছ ঠাট্টা করছি?'

বশিরকে সিরিয়াস দেখায়। 'তা ভাবব কেন? আমিও কিছু ঠাট্টা করিনি। স্বপ্ন তো সবাই দেখতে জানে না। যারা স্বপ্ন দেখে, যাদের স্বপ্নের মধ্যে কাহিনী থাকে, বাণী থাকে, তারা ভালমানুষ। খুব ভালমানুষ।'

নিশির শরীর বশিরের সঙ্গে আরও ঘনিয়ে আসে। 'কি সব কঠিন কথা বলছ, আমার ভয় করছে। আচ্ছা, কেন অমন স্বপ্ন দেখলাম, বলো তো?'

বশির একটু ভাবল। 'স্বপ্ন জিনিসটা আমি তেমন বুঝি না। তবে যা বুঝি—, এটুকু বলতে পারি, তোমার অবচেতন মনে কোথাও ওই সংশয় উঁকি দিয়েছে। হতেই পারে। তোমার চারপাশে যারা আছে, যাদের সঙ্গে সবসময় তোমার ভাব বিনিময় চলছে, তারা কেউ চায় না, আমাদের মিলন হোক।'

নিশি ছোট করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'কারুর চাওয়া না চাওয়ায়

কী যায়-আসে?'

বশির নিশির নরম হাতখানা নিজের মুঠোর ভিতর আড়াল করে ফেলল। 'তাই যদি সত্যি হয় তবে আর স্বপ্নকে ভয় পাচ্ছ কেন?'

নিশি অপলক চোখে বশিরের দিকে তাকিয়ে থাকে। 'তুমি যদি অভয় দাও, কাউকে ভয় পাই না। স্বপ্ন-টপ্ন তো আমি বিশ্বাসই করি না।'

বশির বলল, 'মাত্র কয়েকটা দিন সময় দরকার। তারপরের জীবন শুধু তোমার-আমার। আমরা নিজেরাই নিজেদের নিয়ে মস্ত পৃথিবী গড়ে তুলব।'

নিশি আচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে বশিরের মুখ লক্ষ করে। বশিরের কথার ভিতরেও সেই মাদক ছড়িয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে সত্যি চারপাশে আর কেউ নেই, কিছু নেই। শুধু তারা দু'জন প্রায়ান্ধকার নির্জন বনের ভিতর স্বপ্নের প্রাসাদ তৈরি করছে। ছোট্ট প্রাসাদ দেখতে দেখতে প্রকাণ্ড হয়ে যাচ্ছে। তৈরি হচ্ছে নতুন এক ভুবন। নিজেকে বিষম হালকা লাগছে নিশির। ইচ্ছে হচ্ছে বশিরের হাত ধরে দূর শূন্যে উড়ে যেতে।

'কী ভাবছ, নিশি? বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা?'

নিশি ধীরে ধীরে বলল, 'তোমাকে অবিশ্বাস করার ক্ষমতাই আমার নেই, বশির। তবু···সবটা ভাবতে পারছি না। শুধু তোমার আর আমার একটা আস্ত পৃথিবী হবে, সেখানে অন্য কেউ থাকবে না···এমন স্বপ্ন দেখানোর পর যদি তুমি হারিয়ে যাও?'

বশির গাঢ় স্বরে হাসল। 'তুমি তো তবু আমাকে হারানোর ভয় পাচ্ছ। আমার সে-ভয়ও নেই।'

'কেন নেই? আমাকে হারালে দুঃখ তোমাকে কাবু করতে

পারবে না, তাই?'

'উঁহুঁ। তোমাকে হারানোর কথা আমি ভাবতে শিখিনি। শিখতে চাইও না।'

সন্ধে ঘনাচ্ছে। জোনাকির ভিড় ঠেলে ঠেলে কটিজের দিকে ফিরে আসে ওরা। কাছেই মানুষের নিচু স্বরের শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ায়। মুখ চাওয়াচাওয়ি করে দু'জনে। যতই অস্পষ্ট হোক, স্বর চিনতে দেরি হবার কারণ নেই। একজোড়া নারী-পুরুষের চাপা স্বর। কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই টের পাওয়া গেল, তারা কোন একটা বিষয় নিয়ে ঝগড়া করছে।

মানু আর মোরশেদা।

ওরা এখানে কেন? কী নিয়ে তাদের এই গোপন ঝগড়া?

নিশি পা বাড়াতে চেয়েছিল। বাধা দিল বশির। নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল আরও কিছুক্ষণ। এরপর ঝগড়া থেমে গেল। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল মানু। কটিজের দিকে নয়, অন্য কোথাও। মোরশেদা ঘুরে দাঁড়িয়ে এগোতেই ওদের মুখোমুখি পড়ল। বিষম চমকে ওঠার কথা। কিন্তু তাকে দেখে অমন কোন আভাস পাওয়া গেল না।

নিশির মনে হলো, অন্যায়টা যেন সে নিজেই করছিল এতক্ষণ। সে কথা বলার জন্য মুখ খুলল। কিন্তু ধরা-গলার কথাটা নিজের কানেই বিচিত্র মনে হলো তার।

'এখানে···এখানে কী করছিলি, মোরশেদা?'

মোরশেদা মুখে হাসি টেনে এনে বলল, 'গোপনে উন্মুক্ত প্রকৃতির বুকে আদিম মানব-মানবীর মত প্রেম করছিলাম।'

'কী যা-তা বলছিস?'

মোরশেদা ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'যা-তা মানে! প্রেম করার অধিকার কেবল তোরই নাকি? আমার নেই?'

'আমার দুলাভাইয়ের সঙ্গে নয়।'

হিহি করে হাসল মোরশেদা। গাঢ় সন্ধ্যায় বনের রহস্যের অন্দরমহলে সেই হাসি ভয়ঙ্কর শোনাল। কয়েকটা জোনাকি পালিয়ে গেল আশপাশ থেকে।

নিশি ধমকের সুরে বলল, 'হাসছিস কেন? হাসির কী হয়েছে?'

'সবসময় দুলাভাইকে নিয়ে তোদের অত ভয় কেন? দুই বোনই দেখছি তাকে একসঙ্গে আগলে রাখতে চাস! কেন, আপা একলা আর পারছে না?'

নিশি একটা রূঢ় উত্তর দিতে যাচ্ছিল, বাধা দিল বশির। 'এসব কথা এখন থাক, নিশি। কে কোথায় শুনে ফেলবে, ঠিক নেই। চলো, কটিজে ফিরে যাই।'

মোরশেদা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে পথে পা দিল। তখনও তার মুখে হাসি লেগে আছে। 'ভয় পাস না, নিশি। তোর দুলাভাই এখন সাত-আট মাইল দূরে। জামিল সাহেবের ফার্মে ককটেল পার্টিতে জমে গেছে।'

স্বর নিচু করে নিশি বলল, 'তার মানে তুই গাছের সঙ্গে প্রেম করছিলি?'

'গাছের সঙ্গে প্রেম করব কোন দুঃখে? জাফর হাসানের মত ম্যানলি পুরুষ হাতের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুই ঘোরের মধ্যে আছিস, দেখতে পাচ্ছিস না। তাই বলে আমিও কি কানা?'

মোরশেদা দ্রুত পা ফেলে কটিজের দিকে এগিয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে অনেকক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে বশির আর নিশি।

হঠাৎ সব কেমন গোলমেলে মনে হয়। দু'জন একসঙ্গে ভুল স্বর শুনল?

কটিজে ফিরে নিশি প্রথমেই ঢোকে মাস্টার বেডরুমে। খুশি বই পড়ছে। দাবার ছক উল্টে পড়ে আছে পাশের টেবিলে। জাফর নেই। তার মানে মোরশেদাকে আর অবিশ্বাস করা যাচ্ছে না।

নিশির কপালে অনেকগুলো ভাঁজ পড়েছে। বশির নীরবে তার কাঁধে হাত রাখে। নিশি সে-ভাষা বুঝতে পারে। সান্ত্বনা পেতে চায় সে। তবু মনের গভীরে একটা কাঁটা খচখচ করে বিঁধতে থাকে সবসময়।

ছয়

মানু ড্রাইভ করতে চেয়েছিল; রাজি হয়নি জাফর। 'না, বস্। এবার আর এতগুলো জীবন আপনার হাতে তুলে দেয়া যায় না।'

মানুর চোখগুলো আগের রাত থেকেই লাল ছিল। সে যখন জাফরের দিকে তাকাল তখন মনে হলো সব রক্ত চোখে গিয়ে জমেছে। জাফরের অবশ্য এমন অনেক রাঙা চোখ দেখা অভ্যেস আছে। সে নিজেও চোখ গরম করতে জানে। অনেক রাত পর্যন্ত বস্-এর সঙ্গে বসে আড্ডা দিয়েছে। স্কটল্যাণ্ডের জনৈক টিচারের

তৈরি সোনালি রঙের পানীয়– সাড়ে সাতশো মিলিলিটারের সবটুকু সাবাড় করেছে দু'জনে। বশির ছোট সাইজের দুটো নিয়েছিল। তৃতীয়টা সাধা হতেই সে বাদ সেধেছে।

খুশি উঠেছে ভোরবেলা। নিশি, মোরশেদা আর কাজের মেয়েটিকে ডেকে তুলেছে। দু'জন নাশতা তৈরি করেছে আর দু'জন ঝটপট মালপত্র তুলেছে গাড়িতে। সবার শেষে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে উঠে কাপড় বদলেছে মানু আর জাফর।

খুশি বিষম বিরক্তির সঙ্গে মানুর দিকে তাকায়। তাকে জবুথবু দেখাচ্ছে। হাঁটার সময় হাঁটুর কাছ থেকে মাঝে মাঝে হুমড়ি খাচ্ছে তার পা। কিছুতেই সোজা রাখতে পারছে না। এই অবস্থায় তাকে ড্রাইভ করতে দেওয়া যায় না। কিছুতেই না। সে একবার বশিরের দিকে তাকায় সাহায্যের আশায়, আর একবার ইঙ্গিতে সাবধান করে জাফরকে।

টঙ্গী পর্যন্ত রাস্তা হয়তো কিছুটা ফাঁকা থাকবে। তারপর সামলাতে হবে জ্যামের ধাক্কা। এরপর বনানী পর্যন্ত মৃত্যু উন্মত্তের মত ছোটাছুটি করে গাড়িগুলোর সঙ্গে। বিশেষ করে দূরপাল্লার মিনিবাস আর ট্রাকগুলোকে দেখে খুশির কেবলই রূপকথার সেই দানোগুলোর কথা মনে পড়ে।

কিন্তু মানুর একটা সমস্যা আছে। সে চায় না, কেউ তাকে আণ্ডার এস্টিমেট করুক। বিষম ঝাঁজের সঙ্গে সে বলল, 'জীবনগুলো নিয়ে কি আমি মারবেল খেলব?'

জাফর ড্রাইভিং সীটে উঠে বসে। 'হয়তো সে-সুযোগও পাবেন না, বস্। তার আগেই আপনার হাতের ফাঁক গলে সব গড়িয়ে পড়ে যাবে।'

হো হো করে হেসে ওঠে সে নিজের রসিকতায়। মানু গোমড়া মুখে বলল, 'তুমি যে ভারি দক্ষতা দেখাতে চাও! কেন, তুমি কি আমার চেয়ে কম টেনেছ?'

'বেশিই টেনেছি, বস্। কিন্তু আমার পা টলছে না।'

'জাফর, ডোন্ট টক ননসেন্স। এক পায়ে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে পাল্লা দেবে? এখনও পুরো পাঁচ মিনিট এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি।'

মাঝখানে এসে দাঁড়ায় নিশি। মানুর হাত ধরে টান দেয়। 'দুলাভাই, অনেক হয়েছে। এবার লক্ষ্মী ছেলেটির মত গাড়িতে উঠে পড়েন তো!'

'আগে একটা বিচার হোক। কোল শুড্‌নট্ কল দ্য কেট্‌ল্ ব্ল্যাক। ওই ছোকরা নিজে পেগের পর পেগ গিলেছে। টিচারের মাল। আগডুম-বাগডুম কিছু নয় বাবা। অথচ আমাকে টিজ করছে। কেন, আমি কি মাতাল হয়েছি?'

খুশি মানুর কানে কানে বলল, 'বলুক না! তোমার কী? তুমি উঠে এসো। দেরি হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছ না?'

মানুর রাগ যায় না। 'হোক দেরি। আগে জাফরের একটা বিচার হোক। ও যা খুশি বলবে? আমি কোয়াড করপোরেশনের ম্যানিজিং ডিরেক্টার। ও কি ভুলে গেছে?'

নিশি আরও নিচু স্বরে বলল, 'দুলাভাই, সবাই আপনাদের লক্ষ করছে। বদনাম ছড়িয়ে পড়লে এখানে আসাই মুশকিল হবে।'

মানু কি ভেবে রণে ভঙ্গ দিল। ড্রাইভিং সীটের পেছনের সারিতে উঠে বসল। জানালার পাশ ঘেঁসে বসে বলল, 'ঠিকমত ড্রাইভ কোরো, জাফর হাসান। পেটে সোনালি গরল পড়লে

তোমার তো আবার অনেককিছু ওলটপালট হয়ে যায়। নিউ এয়ারপোর্ট রোডের মাঝখান দিয়ে ডিভাইডার বসিয়েছে, দেখেছ তো? আবার বলে বসো না, ডিভাইডার তোমার হর্ন শোনেনি, গেঁয়ো পথিকদের মত চাকার নিচে এসে লুটিয়ে পড়েছে।'

মোরশেদা কাঠকাঠ হয়ে বসে আছে শেষ সারির কোণার দিকে। খুব ভয় হচ্ছে ওর। ভয়টা মুখেও নাম লিখে রেখেছে। কে জানে, ঘোরের মধ্যে সে কোন গোপন কথা ফাঁস করে দেয় আর মোরশেদা কোন বিপদে পড়ে।

মানু অবশ্য আর বাড়াবাড়ি করল না। শান্ত হয়ে বসে রইল খুশির পাশে। খুশি ফ্লাস্ক থেকে চা বার করে কাপটা বাড়িয়ে ধরল মানুর দিকে। মানু চা নিল না। সে বাসায় পৌঁছে নাশতা খাবে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল মোরশেদা।

জাফর অ্যাক্সিলারেটরে চাপ বাড়ায়, ক্লাচ ছেড়ে দেবে ভাবছে। গিয়ার থেকে বাম হাত সরিয়ে হ্যাণ্ডব্রেক আঁকড়ে ধরে নামানোর জন্য— এমন সময় মানুর জানালার কাছে হাসি-হাসি মুখ নিয়ে দাঁড়ায় অবিনাশ।

'স্যার, চলে যাচ্ছেন?'

জাফর রাগে বোমার মত ফেটে পড়ে আর কি। রওনা হবার ঠিক আগের মুহূর্তে এ-প্রশ্নের কী মানে হয়? সে মনে-প্রাণে আধুনিক মানুষ হতে চেষ্টা করে, কিন্তু গাড়িতে বসলেই কুসংস্কারের হাতে বিষম বাঁধা পড়ে।

'বস্, ওই রাস্কেলটাকে দশ-বিশ টাকা বকশিশ দিয়ে বিদায় করেন তো!'

মানু 'ও হো, তাই তো! তাই তো!' বলতে বলতে মানি পার্স

বার করে। একশো টাকার নোট বাড়িয়ে ধরে। 'খুশি হয়েছেন, অবিনাশবাবু?'

অবিনাশের মুখে এত হাসি যে সবটা ধরানোর জায়গা হয়নি। 'স্যার, আদাব।'

'আদাব।'

'আবার কবে আসবেন, ম্যাডাম? জামালপুরে আমার ভাই ব্যবসা করে। সবজির আড়ত আছে। ফাইন দেখে বেগুন…'

জাফর বেগুনের বিষয়টা সম্পূর্ণ শোনার আগেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। দাঁতে দাঁত ঘসে গাড়ি ছেড়ে দেয়। খুশি আগেই ভেবে রেখেছিল; সে নিজে কিছু বকশিশ দেবে লোকটাকে। তাড়াহুড়ার মধ্যে ভুলে গেছে। শেষ পর্যন্ত মুখের হাসি দিয়েই খুশি করতে চেয়েছে, জাফরের রাগের কারণে তাও হলো না।

টার্নিং-এর কাছে এসে চাকায় আর্তনাদ তুলে হঠাৎ ব্রেক কষল জাফর। নিশির কপাল ঠুকে গেল সামনের সীটের সঙ্গে। 'জাফর ভাই, আস্তে চালান, প্লীজ—'

মানু কাঁধ ঘুরিয়ে হো হো করে হাসল। 'ভয় পাচ্ছ নাকি, রূপসী শ্যালিকা? জাফর তো গাড়ি চালাতেই জানে না। নেহাত একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স জোগাড় করেছে। তাই চালাতে দিয়েছি। আমি যদি ড্রাইভ করতাম, দেখতে, এতক্ষণে জয়দেবপুর চৌরাস্তা পেরিয়ে…'

একটা ট্রাক ওভারটেক করতে গিয়ে জাফর একটু বেশি তাড়াহুড়া করে ফেলল। মাইক্রোবাসের ডানদিকের দুটো চাকা রাস্তা ছাড়িয়ে ঢালে নেমে গেছে। সে অবশ্য সামলে নিল তাড়াতাড়ি।

মানু নিজেও এবার ঘাবড়ে যায়। 'ডিরেক্টার সাহেব, এবার বোধহয় আপনার একটু সতর্ক হওয়া উচিত।'

জাফর হাসল। 'লজ্জা দেবেন না, বস্। আমি খুবই সাবধানে চালাচ্ছি। বাকিটা তো আল্লাহর হাতে, না কি বলেন?'

নিশি বলল, 'জাফর ভাই, আপনি কিন্তু রিয়ার ভিউ মিররের দিকে একবারও তাকাচ্ছেন না। পেছনে ময়মনসিংহ রুটের একটা বাস ছুটে আসছে দৈত্যের মত। লক্ষ করেছেন?'

জাফর অবহেলা ভরে একবার আয়নার দিকে তাকাল। 'হুঁ, দেখলাম।'

মানু কাঁধ ঘুরিয়ে বাসটার দিকে তাকাল। তার কপালে দুর্ভাবনার রেখা ফুটে উঠেছে। 'মাই ডিয়ার জাফর আলী খান, আমার রূপসী শ্যালিকা সত্যি কথাই বলেছে।'

'আমি নিশ্চয় বলিনি, ও মিথ্যে বলেছে।'

মানু ঝাঁজের সঙ্গে বলল, 'তা হলে সাইড দিচ্ছ না কেন?'

জাফর হাসল। 'আপনিও দিতেন না। ওই বেয়াদব ড্রাইভারকে সাইড দেয়ার মানে হচ্ছে ওর বেয়াদবিটা প্রশ্রয় দেয়া।

মানু গজগজ করতে শুরু করে। 'আমি সাইড দিতাম না বলে এখন তুমিও দেবে না— তার কী মানে হয়? দাও, ওকে বেরিয়ে যেতে দাও।'

বশির বলল, 'জাফর, তুমি বরং স্টিয়ারিং আমার হাতে ছেড়ে দাও।'

'হাসিয়ো না, বশির। মোটর তো দূরের কথা, তুমি মোটর সাইকেলও ভাল করে চালাতে শেখোনি। চুপ করে বসে থাকো।'

বশির সত্যি চুপ করে গেল। জাফরকে এখন কোন নির্দেশ না

দেওয়াই ভাল। বাস পেছন থেকে ক্রমাগত হর্ন দিচ্ছে। জাফরও তাকে ছাড়বে না।

মানু ধমকের সুরে বলল, 'জাফর, হচ্ছেটা কী?'

'ডোন্ট গেট নার্ভাস, বস্। সামনে টার্নিং। ওদিকটায় কী আছে না জেনে সাইড দিই কী করে?'

খুশি বেশ মজা পাচ্ছে ব্যাপারটায়। সে জাফরকে আরও একটু উস্কে দিতে চেষ্টা করল। 'জাফর ভাই, সাইড দেবেন না। বাজাতে বাজাতে হর্ন ফাটিয়ে ফেলুক ব্যাটা।'

দু'টি ছেলেমেয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল। তাদের মাথায় শুকনো খড়ির বোঝা, হাতে আখ। চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে, গল্প করছে আর যাচ্ছে। পথের বাঁকে মাইক্রোবাস ছুটে আসছে, লক্ষ করার সময় নেই তাদের। বেবির মা-ই প্রথম তাদের দেখতে পায়। আঁৎকে ওঠে সে। জাফর নিজেও প্রথমটায় ভেবাচ্যাকা খেয়ে যায়। প্রচণ্ড শক্তিতে ব্রেক কষে। একই সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ছেলেমেয়ে দুটো। বয়স দশ-বারোর বেশি হবে না। এরই মধ্যে জীবনের প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছিল তারা।

সামলে নিয়ে আবার গতি বাড়ায় জাফর। সুযোগ পেয়ে বাসটা ওভারটেক করে এগিয়ে গেছে খানিকটা।

খুশি ক্ষুণ্ন স্বরে বলল, 'জাফর ভাই, বাসটার কাছে হেরে গেলাম আমরা।'

'ভাববেন না, ভাবী। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমরা আবার তাকে ধরে ফেলব।'

নিশি আতঙ্কগ্রস্তের মত বলল, 'জাফর ভাই, আপনি মস্ত বড় গাড়ি চালানেওয়ালা, মেনে নিচ্ছি। আপার কথায় নাচবেন না। ওই

দেখেন, আবার একটা ট্রাক এসেছে পেছনে।'

'তুমি বলতে চাও, ওই লক্কড় মার্কা ট্রাককেও সাইড দেব?'

মানুর চোখে ঢুলুনি এসেছিল। কথাটা শুনে চোখ মেলে তাকায়। 'জাফর, দরকার হলে গরুর গাড়িকেও সাইড দিতে হয়।'

'আপনি ঘুমান তো, বস্।'

নিশি আবার বলল, 'আমার ভয় করছে, জাফর ভাই। ওই ট্রাকগুলো অ্যাক্সিডেন্ট ঘটাতে ওস্তাদ।'

মোরশেদা বলল, 'তুই আর তোর দুলাভাই একই রকম। আচ্ছা ভিতু। অত টেনশন করছিস কেন? সীটে হেলান দিয়ে বস।'

নিশি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকল। জাফর গাড়ির গতি কমিয়ে দেয়।

মোরশেদা তার কানে কানে বলল, 'একটা জোক শুনবি? স্বামী আর স্ত্রী গিয়েছে সিনেমায়। খুব রোম্যান্টিক একটা দৃশ্য চলছে, বুঝলি? স্ত্রী বলল কি...'

নিশি অধরে ওষ্ঠ চেপে বলল, 'এটা খুব অশ্লীল জোক। অন্য একটা বলো।'

মোরশেদা একটু ভাবল। 'বেশ। এক গর্ভবতী মা তার আট বছরের মেয়েকে ডেকে...'

বোমা বিস্ফোরণের মত শব্দ হলো একটা। নিশি কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখল, রাস্তা তাদের গাড়ির ছাদের ওপর উঠে পড়েছে। বোকার মত উপুড় হয়ে আছে দু'পাশের গাছগাছালি। এঞ্জিন গোঁ গোঁ করে উঠে থেমে গেল। ধোঁয়া আর ধুলোয় অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। বশির হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরে নিশিকে। অন্য কারুর কথা ভাবতে পারেনি। তার নিজের বাম হাতের

খানিকটা কেটে গেছে। রক্তে ভিজে গেছে শার্টের হাতা। হাতে একটু গরম লাগছে, এ ছাড়া অন্য কোনও অনুভূতি পাচ্ছে না।

মানু চিৎকার করে উঠল দু'সেকেণ্ড পরেই। এই দু'সেকেণ্ড তার কাছে দুটো দীর্ঘ ঘণ্টার মত মনে হয়েছে। তার শরীরও প্রায় অক্ষত। স্টিয়ারিং ঝুঁকে পড়ে আছে জাফরের মুখের ওপর। মুখের সাদা হাত বেরিয়ে পড়েছে। নিশি কেঁপে উঠল সেদিকে তাকিয়ে। এরপর না তাকিয়েও সে কেঁপে ওঠে। যেদিকে তাকায় সেদিকেই ওই দৃশ্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাঁপুনি ক্রমেই বেড়ে যায়। বশির জানালার কাচ ভেঙে কোনরকমে একটা পথ করে। পা দুটো গলিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাইরে। মানু উন্মত্তের মত চিৎকার করছে। খুশিকে টেনে বার করার সব চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে তার। নিশিকে বেরুতে সাহায্য করে ঘুরে খুশির দিকটায় চলে যায় বশির। তার পাশের জানালাটা ভেঙে গেছে। কিন্তু সত্যি তাকে বার করার উপায় নেই। সীটটা ভেঙে চেপে আছে তার উরুর ওপর। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সীট, গাড়ির তোবড়ানো ছাদটা—যাকে এখন মেঝে বলা যায়, সেখানে বীভৎস দৃশ্য। সেদিকে তাকিয়ে নিশির কাঁপুনি থেমে গেল। বোঝা যাচ্ছে না খুশি বেঁচে আছে কি না।

বেবির মা বসে ছিল একেবারে পিছনের খালি জায়গাটায়, একগাদা ক্রোকারি আর টুকিটাকি জিনিসপত্রের সঙ্গে। সেইসব জিনিসপত্রের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে বেবির মা। পেট্রোলের গন্ধের সঙ্গে মিশেছে রক্তের গন্ধ। পোড়া লুব্রিক্যান্টস আর মানুষের মাংসপেশী মিলে গেছে। এইসব ঘটতে সময় লেগেছে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড।

কাছে-দূরে মানুষের মিলিত চিৎকার শোনা গেল। সাহায্যের

আশায় ঘুরে দাঁড়ায় বশির। যত মানুষ ছুটে আসছে, তার চেয়ে বেশি শোনা যাচ্ছে তাদের গলা। পুরো দু'মিনিট লাগল লোক জড়ো হতে।

রাস্তার অন্য পাশে কাত হয়ে ভোঁতা নাকে দাঁড়িয়ে আছে একটা ট্রাক। কোনও মালপত্র নেই। ড্রাইভারের চেম্বারও শূন্য। ট্রাকের সামনের অংশ দুমড়ে গেছে। ভেঙে গেছে উইণ্ডশীল্ড। অন্য কোন ক্ষয়-ক্ষতির চিহ্ন নেই। বোঝা যায়, ড্রাইভার-হেলপার পালিয়েছে অ্যাক্সিডেন্টের সঙ্গে সঙ্গে।

টঙ্গী থেকে অ্যামবিউল্যান্স এসে পৌঁছল দশ মিনিটের মধ্যেই। তার আগেই লোকজন ছুটে এসে প্রাথমিক সেবা-শুশ্রূষা শুরু করেছে। খুশিকে টেনে বার করা হয়েছে। নিশি আর বশির অসহায়ভাবে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। খুশি বেঁচে আছে, একবারও মনে হয়নি ওদের। সে যখন অস্ফুট স্বরে ককিয়ে উঠল, নিজের অজান্তে হেসে ফেলেছে নিশি।

'ভয় পেয়ো না, আপা। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

জাফরকেও বার করা হয়েছে। মাথায় ঠাণ্ডা পানির স্পর্শ পেয়েই জ্ঞান ফিরেছে তার। অবসন্ন চোখে তাকিয়ে আছে বেবির মা আর খুশির দিকে। খুশির সাড়া পাওয়া গেলে সবার ধারণা জন্মেছিল, বেবির মাও কেবল জ্ঞান হারিয়েছে। ঠিকমত চিকিৎসা পেলে ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু টঙ্গী হাসপাতালের জরুরী বিভাগের অন-ডিউটি মেডিক্‌ল্ অফিসার জানালেন, বেবির মা বেঁচে নেই।

ডাক্তার স্ত্রীলোকটির নাম জানতে চাইলেন। খুশি বা মানু--কেউ বলতে পারল না। তাকে বেবির মা বলেই ডাকা হয়। তার নিজের একটা নাম আছে, কথাটা ওদের কারুর কখনও মনে হয়নি।

কিন্তু নাম ছাড়া সার্টিফিকেট ইস্যু হবে না। নিশি এই বিপদ থেকে মানুকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে।

'ডাক্তার সাহেব, ওর নাম জুলায়খা বানু।'

এই দুঃসময়ের মধ্যেও ছোট বিষয়টা মন থেকে তাড়াতে পারে না নিশি। নারী তার অসহায় অবস্থার জন্য নিজেই অনেকটা দায়ী। মৃত্যুর সময় তার নাম খুঁজে পাওয়াও কঠিন হয়ে ওঠে।

মোরশেদা ভুল বকছিল। সে একাই কথা বলছে, নিশিকে বারবার অনুরোধ করছে জোক শোনার জন্য। বুঝিয়ে, ধমক দিয়ে, কোনভাবেই তাকে নিরস্ত করা যাচ্ছে না।

'নিশি, একটা ফাইন গল্প আছে, শোনো।'

'আহ, মোরশেদা, এখন না।'

'লক্ষ্মীটি, এটা খুব ভাল চুটকি, অশ্লীল না। এক গর্ভবতী মা কি করেছে, তার আট বছরের মেয়েকে ডেকে বলেছে...'

ডাক্তার মোরশেদাকে একটা পৃথক ক্যাবিনে নিয়ে গেলেন। বেডে শুইয়ে দরজা টেনে দিলেন আর নার্সকে ডেকে বললেন, 'ওকে এক ফাইল লারগেকটিল দাও।'

নিশি ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল, 'ওর কি কোন মেজর ক্ষতি হয়েছে, ডাক্তার সাহেব?'

'না। হঠাৎ একটা মানসিক শক পেয়েছে। বিকার আর কি। রেস্ট নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। কোন আঘাতের চিহ্ন তো পেলাম না।'

নিশি বশিরের বেডের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। তাকে ফার্স্ট এইড দেওয়া হয়েছে। চোখ বুজে শুয়ে আছে। নিশি তার মাথায় হাত রাখল। কানের পেছনে রক্ত জমে আছে। দু'হাতে মুছে নিল সে-

রক্ত। হাত ধুয়ে ফিরে এসে দেখল, খুশি খুব কাতরাচ্ছে। একজন নার্স ট্রলি নিয়ে তার বেডের পাশে রেখে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে। ভেবে পাচ্ছে না, কী করবে।

'সিসটার, ওকে ঘুম পাড়ানো যায় না? খুব কষ্ট পাচ্ছে বেচারি।'

নার্স সহানুভূতির দৃষ্টিতে নিশির দিকে তাকাল। 'একটু দেরি হবে। ওনার এক্স-রে দরকার।'

'এক্স-রে না হয় পরেই করবেন।'

'উপায় নেই। মেডিকেল অফিসার খুব টেনশন করছেন।'

ফার্স্ট এইড নেবার পর বারান্দার কোণায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়েছে মানু। একটা গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে। খুশিকে তাড়াতাড়ি ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন এখানকার ডাক্তার।

নিশি মানুর কাছে দাঁড়িয়ে চোখে ওড়না চাপা দেয়। 'কেমন করে হলো, দুলাভাই?'

মানু চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'আপনার উচিত ছিল জাফর ভাইকে আরও কড়া ধমক দেয়া।'

মানু ক্লান্ত স্বরে বলল, 'জাফরের দোষে অ্যাক্সিডেন্ট হলে মনে একটা সান্ত্বনা পেতাম। কিন্তু আসলে দোষ তো ওই ট্রাক ড্রাইভারের।'

নিশি নাক-চোখ মুছল। 'আমার ঠিক মনে পড়ছে না।'

'পেছনের ট্রাকটার কথা মনে নেই? ওই ট্রাকটা আমাদের গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে ব্যালান্স হারিয়ে ফেলেছিল। ডানদিকের কোণা বরাবর লাগিয়ে দিয়েছে।'

'তা হলে বেবির মা কীভাবে মারা গেল?'

'ওর তো গদিওয়ালা সীটের প্রটেকশন ছিল না। ঝাঁকুনিতে ওর মাথা খুব জোরে বাড়ি খেয়েছে রুফের সঙ্গে। ওতেই মারা গেছে বেচারি।'

নিশি বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিছু বলল না।

খুশির অবস্থা ক্রমেই খারাপ পরিণতির দিকে যাচ্ছে। জাফরের চিকিৎসা অসমাপ্ত রেখে টঙ্গী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ওদের সবাইকে গাড়িতে তুলে দিল। ফ্ল্যাগ স্ট্যাণ্ডে লাল কাপড় উড়িয়ে ঢাকায় চলে এল পুরানো মডেলের ডেলিভারি ভ্যান।

বেবির মা-র ডেডবডি বারডেমের শীতল সংরক্ষণাগারে রেখে খুশিকে নিয়ে যাওয়া হলো পঙ্গু হাসপাতালে। এখানকার ডাক্তাররা টঙ্গী হাসপাতালের ডাক্তারদের রিপোর্ট, এক্স-রে— কোনটাই বিবেচনায় আনতে চান না। নতুন করে পরীক্ষা করা হলো।

স্পেশ্‌ল্ ক্যাবিন থেকে ঘণ্টাখানেক পর বেরিয়ে এলেন তিনজন ডাক্তার। নিশি আর মানু বিষম উদ্বিগ্ন মুখে তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

সবচেয়ে তরুণ ডাক্তারটির নাম তোহা। তার সাদা ওভারকোটের ওপর নেমপ্লেট লাগানো আছে। তাচ্ছিল্যের সুরে সে বলল, 'পেশেন্ট আপনার কী হয়?'

মানু বলল, 'স্ত্রী।'

'ওনার পা কেটে বাদ দিতে হবে।'

নিশি শিউরে উঠল। মানু ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে। 'ডাক্তার সাহেব, টাকার জন্যে চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু দেশের অ্যাভেইলেব্‌ল্ বেস্ট ট্রিটমেন্ট আমি আমার স্ত্রীর জন্যে চাই। ওর পা...'

প্রৌঢ় ডাক্তারের নাম এম. রহমান। তিনি বললেন, 'দেখা যাক, কি করা যায়। আপনারা এখন যান, বিশ্রাম নিন গে।'

বাসা থেকে একটি কার এসেছে খবর পেয়ে। অফিস থেকে জীপও আনা হয়েছে। হাসপাতাল করিডর লোকারণ্য হয়ে উঠল। বেশির ভাগই কোয়াড করপোরেশনের লোকজন। নিশি আর মোরশেদা জীপে উঠল। মোরশেদাকে শাহজাহানপুরে নামিয়ে সে বাসায় ফিরবে।

রাজারবাগ মোড়ের কাছে এসে মোরশেদা ঘোর-লাগা চোখে নিশির দিকে তাকাল। জোকটা বলার জন্যে সে জোঁকের মত ওর পিছনে লেগে আছে। 'শোন, এক মহিলা, অন্তঃসত্ত্বা, তার মেয়েকে...'

নিশি তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'এই যে...তোর বাসায় পৌঁছে গেছি। জোকটা অন্য একদিন শুনব, কেমন?'

সাত

জাফর পরদিনই সুস্থ হয়ে উঠল। ব্যাণ্ডেজের কারণে সে কথা বলতে পারছিল না। ব্যাণ্ডেজ খোলার পর তার প্রথম কথা: 'আমি কি মারা গিয়েছিলাম?'

মানুর মনের অবস্থা ভাল ছিল না। কড়া ধমক দিয়ে বসল জাফরকে। 'মারা যাওনি ঠিকই। কিন্তু চেহারার যা অবস্থা করেছ তাতে ঘাটের মড়া ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যাচ্ছে না। বেবির মা-কে তুমিই মেরেছ। খুশি-র পা কেটে বাদ দিতে হচ্ছে। বশিরের হাতের এক পাউণ্ড মাংস লাপাত্তা, ইঞ্চি দু'য়েক হাড়ের অবস্থা শোচনীয়। ইয়ার্কি করার মত মুড তোমার এখনও আছে?'

জাফর সবই জানে। কিন্তু অনুশোচনার কোন লক্ষণ তার মুখে দেখা গেল না। সে পরম পরিতোষের সঙ্গে নিশির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। রাত জেগে সেবা করেছে নিশি। মানু সঙ্গে থাকতে চেয়েছিল, তাকে জোর করে বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছে। নাহ্, এই রকম সেবাময়ী আর শুশ্রূষাময়ী নারীই তার জীবনে দরকার। সে খুবই উচ্ছৃঙ্খল। ঘরের মানুষটি যদি পারফেক্ট বাঙালি ললনা না হয়, ভবিষ্যৎ জীবনে দুর্ভোগ আছে।

শরীরে যন্ত্রণা বা অস্থিরতা না থাকলেও সে বারবার কাতর আর্তনাদ করে ওঠে। নিশি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় তার কাছে। বশিরের হাতে ড্রেসিং করা হয়েছে, ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে। মাঝরাতে তার মাথার কাছে বসে নিশি নিঃশ্বাসের বাড়তি উষ্ণতা টের পায়। নার্সকে ডেকে শরীরের তাপ নিতে বলে। নার্স গম্ভীর মুখে জানাল, তার জ্বর এসেছে। একশো তিন পয়েন্ট পাঁচ। জ্বর কমানোর জন্য ব্যবস্থা নিয়েছে নিশি। বশির একবারও আর্তনাদ করেনি। স্বাভাবিকভাবেই সে সেবা পেয়েছে কম।

অন্যদিকে জাফর সেবা আদায় করে নিতে জানে। সামান্য কারণেও কখনও কখনও বিনা কারণে সে খাটিয়েছে নিশিকে। নিশি দৈহিকভাবে তাকে সেবা করেছে, কিন্তু মন পড়ে থেকেছে বশিরের

দিকে। এই গোপন খবর বশির আর সে ছাড়া কেউ জানে না, জানার কথাও নয়।

মানু বাসা থেকে হাসপাতালের ক্যাবিনে এসে পৌঁছল সকাল ন'টার মধ্যে। রাতে খুব গরম পড়েছিল। ঘুম ভাল হয়নি। সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত ঘুমিয়েছে সে। প্রথমে ঢুকেছে খুশির ক্যাবিনে। এখনও সেখানে মানু ছাড়া অন্য কারুর প্রবেশাধিকার হয়নি। ডাক্তার এম. রহমানের সঙ্গে দেখা করেছে। তারপর এসে বসেছে বশির আর জাফরের ক্যাবিনে।

দু'চারটে কথা বলার পরই জাফর বুঝতে পারে, মানুর সঙ্গে এখন কোন রকম রসিকতা করা ঠিক হবে না। সে চটপট প্রসঙ্গ বদলে ফেলল।

'ভাবীর অবস্থা কেমন?'

'আজকের দিনটা না গেলে বোঝা যাবে না।'

বশির এখন মোটামুটি সুস্থ। একটু আগে সে করিডর দিয়ে হেঁটেছে, কারুর সাহায্য না নিয়েই। একটা এক্স-রে দরকার হয়েছিল। অনেকটা পথ হেঁটে এক্স-রে ওয়ার্ডে যেতে হয়। নিশি বাধা না শুনে সঙ্গে গিয়েছে। এক্স-রে রিপোর্টে আশঙ্কাজনক কিছু নেই। নর্মাল ফাইণ্ডিং।

নিশি মানুর হাত থেকে টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে খুলে ফেলে। সকালের নাশতা বার করে সবাইকে খাওয়ায়, নিজে খায়।

মানু গাঢ় স্বরে বলল, 'অনেকদিন পর অন্য হাতের নাশতা খাচ্ছি।'

নিশির হাত অসাড় হয়ে এল। বেবির মা-র রান্না বাসার সবার এত প্রিয় যে অন্য কারুর হাতের খাবার আর এদের মুখে রোচে না।

বশির বেড থেকে উঠে আসে। টিফিন ক্যারিয়ার তুলে নেয় নিজের হাতে। সবার হাতে নাশতা তুলে দেয়।

'কিছু করার নেই, নিশি। জীবন তো থামিয়ে রাখা যাবে না।'

মানু বলল, 'কাল রাতে নাকি তোমার জ্বর এসেছিল। বেশি নড়াচড়া কোরো না।'

'না, বস্। নিশি নড়াচড়ার সুযোগ বড় একটা দিচ্ছে না।'

জাফর নাশতা সামনে নিয়ে বসে থাকল। নিশি দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে আসে। চামচে তুলে নাশতা খাইয়ে দেয় জাফরকে। মানু আড়চোখে বশিরের দিকে তাকায়। তার চোখে কিছু কথা ফুটে ওঠে। কিন্তু বশির এখন সে-ভাষা পড়ে দেখতে চায় না। মুখ ঘুরিয়ে খাবারে মন দেয় সে।

বিকেলে রাউণ্ডে এলেন অর্থোপেডিক্স-এর প্রফেসর। ডাক্তার এম. রহমান আর ডাক্তার তোহার সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। বশির আর জাফরকে ছুটি দিলেন। খুঁটিয়ে পড়লেন খুশির ফাইল। এক্স-রে প্লেট আর রিপোর্টগুলো নিয়ে মত বিনিময় করবেন।

সন্ধের দিকে দুরুদুরু বুকে মানু তাঁর মুখোমুখি হয়। 'কেমন দেখলেন, প্রফেসর সাহেব? ওর পা বাঁচানোর কি কোন উপায় নেই?'

প্রফেসর চশমা নামিয়ে রেখে চোখ কুঁচকে তাকান। 'বুঝলাম না।'

'পা না কেটে ভাল করে দেয়া একটুও সম্ভব না?'

'পা কেটে ফেলতে হবে— কে বলেছে আপনাকে?'

মানু ভেবে পেল না তোহার নামটা বলবে কি না। ডাক্তার তোহা নিজেই বলল, 'স্যার, প্রাইমারি অবজার্ভেশন থেকে আমার মনে হয়েছিল...'

'ও, তুমি! তোমাদের অনেকবার বলেছি, রোগীর অবস্থার ব্যাপারে শিওর না হয়ে তার গার্জেনদের কিছু বলবে না। অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যায়।'

'সরি, স্যার।'

প্রফেসর সাহেব বললেন, 'পা কেটে বাদ দেবার দরকার হবে না। তবে উনি আর কখনও হাঁটতে পারবেন না। অন্তত এখন পর্যন্ত আমার তাই ধারণা।'

মানু প্রফেসরের হাত জড়িয়ে ধরল। 'আমি আপনাদের বেস্ট অ্যাটেনশন আশা করি, প্রফেসর সাহেব।'

'আমরা চেষ্টার ত্রুটি করব না। কিন্তু আগেই-বলে রাখি, ওনার পা পুরোপুরি ভাল হবার চান্স ফিফটি ফিফটি। আর ভাল হলেও, আগামী এক বছরের মধ্যে উঠে দাঁড়াতে পারবেন না উনি।'

ডাক্তারদের রাউণ্ড শেষ হলো। মানু খুশির ক্যাবিনে ঢোকে নিঃশব্দে। তার ঘুম ভেঙেছে। অনেকক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ছাদের দিকে। মানু তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

নার্স এসে দুটো পিল খাওয়াল তাকে। বাইরে থেকে দরজা টেনে বন্ধ করে চলে গেল। মানু খুশির আরও কাছে ঘনিয়ে বসে।

'ব্যথাটা কমেছে?'

'ব্যথা নেই। কিন্তু কোন পায়ে সাড়া পাচ্ছি না।'

মানু খুশির হাঁটুর কাছটায় আঙুল বুলিয়ে দিল। ধীরে ধীরে বলল, 'সময় লাগবে।'

খুশির দু'চোখে অশ্রু ছটফট করে ওঠে। 'সত্যি করে বলো তো, আমি ভাল হব?'

হাসতে চেষ্টা করল মানু। 'নিশ্চয় ভাল হবে আমি সারাজীবন

যত উপার্জন করেছি, সব ব্যয় করব। দরকার হলে বিদেশে নিয়ে যাব তোমাকে।'

'কিন্তু···আমার মন বলছে···'

'দুর্ভাবনা কোরো না, খুশিয়া বেগম।'

খুশি ফুঁপিয়ে উঠল। 'তুমি যা-ই বলো, আমার মন বলছে, আমি আর ভাল হব না। সারা জীবনের জন্যে পঙ্গু হয়ে গেলাম।'

'দূর! কী যা-তা বলছ? প্রফেসর নিজে সব রিপোর্ট-টিপোর্ট দেখে বললেন, ম্যাক্সিমাম একবছর কষ্ট করতে হবে। তারপরই তুমি পায়ে শক্তি ফিরে পাবে।'

'আর যদি না পাই?'

মানু খুশির ঠোঁটের ওপর আঙুল বোলাল। 'তাতেই বা কী? আমি তো সুস্থ আছি! আমি তোমাকে আগলে রাখব।'

খুশি আদুরে স্বরে বলল, 'লোকে আমার দিকে অবাক চোখে তাকাবে। তোমাকে করুণা করবে। একটু ঠাট্টা আর উপহাস মিশিয়ে বলবে, "আহা রে! বেচারা খোঁড়া বউয়ের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে।"···তোমার কষ্ট হবে না?'

'না।'

খুশির বুকটা হালকা হয়ে যায়। নির্ভার হয়ে যায়। নিজেকে মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। কিন্তু এই ভাবটা বেশিক্ষণ ধরে রাখা মুশকিল হয়। 'কিন্তু···তোমার যে কষ্ট হবে! মানুষের কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু তোমার মন মানসিকতা তো আমি জানি। তুমি বেপরোয়া, উদ্দাম গতিতে ছুটতে পছন্দ করো। তুমি আমাকে নিয়ে সমুদ্রের জলে সাঁতার কাটতে চাও, উঁচু পাহাড় বেয়ে উঠতে চাও। মাঝে মাঝে বন-জঙ্গলে রাত না কাটালে তোমার ভাল লাগে

না। এখন কী হবে? আমার পা তো গেছে!'

'আহ্, বললাম না, তোমার পা ভাল হয়ে যাবে। একটা-দেড়টা বছর না হয় পাহাড়-জঙ্গল বাদই দিলাম। আমি তো তোমার পাশেই ছিলাম! আমিও পঙ্গু হয়ে যেতে পারতাম। আরও বড় কোন বিপদও হতে পারত। মারা গেলেই বা কী হত?'

খুশি ভয়ে ভয়ে বলল, 'আচ্ছা, ধরো দুটো বছর আমি পঙ্গু হয়ে রইলাম। তুমি সত্যি অপেক্ষা করবে আমার জন্যে?'

'সারা জীবন অপেক্ষা করব।'

খুশি অনেকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে মানুর দিকে তাকিয়ে থাকে। 'সত্যি বলছ? কোনদিন আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না?'

মানু তার মাথার এলোমেলো চুলগুলো বিন্যস্ত করে দেয়। 'পাগল নাকি?'

খুশি বলল, 'তুমি হয়তো বিশ্বস্ত থাকতে চাইবে। কিন্তু চারপাশে কত প্রলোভন। হয়তো ইচ্ছের বিরুদ্ধেও তুমি কারুর ফাঁদে পড়ে যাবে। তখন আমি কী করব?'

মানু হাসল। 'আমাকে তুমি আটকে রাখবে, খুশিয়া বেগম। তোমার অধিকার আছে।'

'অধিকার আছে, মানলাম। কিন্তু তোমাকে আটকানোর শক্তি কোথায় আমার?'

মানু বলল, 'বাজে চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে দাও। নইলে শরীর ভাল হবে না।'

খুশি মানুর হাত নিজের হাতের মুঠোয় ধরে রাখল। 'তোমার সঙ্গে আর কোথাও বেড়াতে যাওয়া হবে না।'

'একশো বার হবে। জুনমাস পর্যন্ত খুব ব্যস্ত থাকব। জুলাই মাসে

আবার আমরা আউটিং-এ যাব। ততদিনে তুমি ভাল হয়ে যাবে।'

খুশির মুখে করুণ হাসি খেলা করে। 'মিথ্যে সান্ত্বনা দিচ্ছ কেন? তুমি কি ভাবো ডাক্তারদের মুখের ভাব আমি বুঝি না?'

মানু বিরক্ত হয়। 'ডাক্তাররা অমন বলেই থাকে। তা ছাড়া নাই বা পারলে হাঁটতে। তাই বলে বেড়াতে পারবে না—এটা একটা কথা হলো? আমাদের চারপাশে কত লোকজন! গাড়ি আছে। আমি আছি।'

খুশির মুখে মেঘ-ভাঙা রোদের মত আলোর আভাস দেখা দেয়। কিন্তু দুর্ভাবনা পুরোপুরি মিলিয়ে যায় না। 'জুলাই মাসে বেড়াতে বেরুবে? যাহ্!'

'যাহ্ মানে!'

'ওই সময় ভরা বর্ষা। একটানা বৃষ্টি হয়।'

'ও, হ্যাঁ। এটা তো ভেবে দেখিনি। তাহলে আগস্ট মাসে যাব।'

খুশি বলল, 'আগস্ট-সেপ্টেম্বর বিষম ব্যস্ত থাকবে তোমরা। খুলনার নতুন স্টেশন চালু করার কাজ। মনে নেই?'

মানু নীরবে মাথা দোলায়। শারীরিকভাবে অক্ষম হলে মানুষের মানসিক ক্ষমতা বেড়ে যায়, কোথায় যেন শুনেছে।

'আচ্ছা, তাহলে অক্টোবরে যাব আমরা।'

'কথা দিচ্ছ?'

'একদম পাকা কথা, ম্যাডাম খুশিয়া।'

খুশি সত্যি সত্যি খুশি হয়। 'কোথায় যাবে?'

'তুমিই বলো। যেখানে তোমার ইচ্ছে, যাব। সিলেট কিংবা কক্সবাজার।'

'উঁহুঁ। ওই ন্যাশনাল পার্কেই যাব। ওরকম জায়গা আর হয় না।

যাবে?'

মানু বলল, 'কেন যাব না? নিশ্চয় যাব। শুধু আমরা দু'জনে।'

খুশি মানুর হাত মুঠোর ভিতর চেপে ধরে। 'তুমি আমারই থাকবে তো?'

মানুর মনে হলো মুহূর্তের জন্যে সে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। বউয়ের কথাটা সে পুরোপুরি শুনতে পায়নি। সে অবশ্য তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল, 'কী যে বলো তুমি! খামোকা অবিশ্বাস করার কী হয়েছে?'

'আমি তোমাকে অবিশ্বাস করতে চাই না। তবু তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই। বলো, তুমি শুধু আমারই থাকবে তো?'

মানু হেসে বলল, 'আমি তোমারই।'

বাইরে, পরদার আড়ালে অপেক্ষা করছিল নিশি আর বশির। নিশির মুখে লজ্জা মাখানো হাসি। যেন কথাগুলো খুশি আর মানু নয়, ওরা দু'জনই বলাবলি করছে। বশির চাপা গলায় বলল, 'চলো, এখন যাই। পরে আসব।'

নিশির যেতে ইচ্ছে করছে না। আরও নিচু গলায় বলল, 'একটু দাঁড়াও।'

বশির নিঃশব্দে হাসল। তারপর বলল, 'কারুর প্রাইভেট আলাপে আড়ি পাতা ট্রেসপ্যাসের চেয়েও খারাপ।'

নিশি টানা-টানা চোখ মেলে বশিরের দিকে তাকাল। 'নিজেদের ঘরে, নির্জনে, নিরাপদে ওইভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি। তোমার হাতে হাত রাখতে চাই।'

বশির বলল, 'বুকে সাহস সঞ্চয় করো। তারপর আমার সঙ্গে পা বাড়াও। হাত আপনা থেকেই হাতে বাঁধা পড়বে। রাজি আছ?'

নিশি আলতো করে বশিরের কাঁধে হাত রাখে। 'আমি তো পা বাড়িয়েই আছি।'

ফিরে আসার জন্য পা বাড়াতেই পরদা দুলে ওঠে। খুশি মানুর হাত ছেড়ে একটু সরে বসে। মানু দরজার দিকে তাকায়। পরদার নিচে দু'জোড়া পা দেখে চিনতে পারে, কারা দাঁড়িয়ে আছে।

'ওখানে দাঁড়িয়ে কেন তোমরা? ভিতরে এসো।'

বশির আর নিশি এসে খুশির পাশে বসে। উঠে দাঁড়ায় মানু। 'তোমরা ওর কাছে বসো। গল্প করো। আমি একটু অফিসের ঝামেলা মিটিয়ে আসি।'

বশির কিছু বলল না। নিশি বলল, 'দেরি করবেন না, দুলাভাই। আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না।'

খুশি ম্লান চোখে বোনের দিকে তাকায়। 'এখনই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিস তোরা? যদি আর কোনদিন ভাল না হই? কী করবি? আবর্জনার মত ডাস্টবিনে ফেলে রাখবি নাকি আমাকে?'

নিশি চিরুনি বার করে খুশির চুল আঁচড়ে দিতে শুরু করে। 'কি যে বলো, আপা!'

খুশি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'কিছু মনে করিসনে। তোদের কোন দোষ নেই। যথেষ্ট চেষ্টা করছিস আমার মনটা ভাল রাখতে। তবু এখনই তোদের মুক্ত জীবন দেখে ঈর্ষা হচ্ছে, জানিস?'

বশির বলল, 'ভাবী, আপনি ইনটেলিজেন্ট মানুষ। আপনাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দেয়া আমার উচিত না। কিন্তু বিশ্বাস করেন, আমার মন বলছে, আপনি শিগগিরই ভাল হয়ে উঠবেন। খুব শিগগিরই।'

খুশির চোখ ছলছল করে উঠল। 'আপনার মনটা খুব ভাল, বশির ভাই। আপনি যদি ডাক্তার হতেন, হয়তো সত্যি সান্ত্বনা পেতাম।'

নিশি ফ্লাস্ক খুলে কাপে চা ঢালল। খুশিকে এক কাপ দিল। এক কাপ বাড়িয়ে ধরল বশিরের দিকে।

অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল মানু। নিচের সিঁড়িতে পা দেবার আগেই তার মনে হলো কেউ লক্ষ করছে তাকে। মোরশেদাকে হঠাৎ সামনে দেখতে পেয়ে শরীরে আর মনে বিচিত্র এক অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে। শেষের সিঁড়িটার কথা আর মনে থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই বেশ বড় মতন ঝাঁকুনি সামলাতে হয় তাকে।

মোরশেদা হেসে ফেলে প্রথমে। তুখোড়, চটপটে একজন মানুষ— যে নিজেকে 'ম্যানিজিং-ম্যান' বলে দাবি করে—হঠাৎ একটা সিঁড়ির কাছে বোকা বনেছে দেখলে হাসি পাবারই কথা। কিন্তু সে যতই এগিয়ে আসে, মানুর চোখের ভাষা বদলে যায়। সে যতই হাসিটা বজায় রাখতে চেষ্টা করে, বুঝতে পারে, মুখে ততই অন্ধকার ঘনাচ্ছে।

মানু এক ফুট ব্যবধানে এসে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে মোরশেদার দিকে। মোরশেদা তাকে এড়াতে চায়, পারে না। থমকে দাঁড়াতে হয় তাকে। আবার মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে হয়।

'কোথায় যাচ্ছেন?'

গত কয়েকটা দিনে অনেককিছু বদলে গেছে। মানু মোরশেদার সম্বোধনে পরিবর্তন লক্ষ করে। সে আর দুলাভাই বলে তাকে ডাকে না।

দুলাভাই ডাকটা মিষ্টি, মানু নিশ্চয় স্বীকার করবে মনে মনে। ওই ডাকটার বদলে সে অবশ্য অনেক কিছু আশা করে মোরশেদার কাছ থেকে। তার কতটুকু মিষ্টি আর কতটুকু তেতো, সে এখনও জানে না। তবু আশা ছাড়তে পারে না।

'এসো, ওই ক্যান্টিনে বসি। তোমাকে দেখে মনে হলো, কিছু জরুরী কথা বাকি থেকে গেছে। সেরে নেয়া যাক।'

সম্মোহিতা মোরশেদা অনুসরণ করে মানুকে।

আট

বেলা এগোরোটার দিকে মানুর ঘুম ভাঙল টেলিফোনের তীব্র, তীক্ষ্ণ ধমকে। সত্যি খুব বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। আগের রাতে জমজমাট পার্টি ছিল গুলশানের এক হোটেলে। ক্লিনিকে গিয়ে খুশির সঙ্গে দেখা করে বাসায় ফিরেছে রাত একটার দিকে। আজ তার জরুরী কাজ ছিল অফিসে, সকাল দশটার মধ্যে ডেস্কে বসার কথা।

'কী হলো, বস্? হ্যাঙওভার কাটেনি?'

মানু হাসল। 'হ্যাঙওভার কী বলছ, মাই ডিয়ার ডিরেক্টর? আমি তো হাঙ হয়ে গেছি। খুলনার নতুন বাস স্টেশনের কাজটা আমরা পাচ্ছি না।'

জাফর গম্ভীরভাবে হাসল। 'তারপর?'

'হাসছ যে! ওই কাজে অলরেডি আমরা কত খরচ করেছি, মনে আছে?'

'এক মিনিট, বস্।' জাফর ফাইল ওল্টাচ্ছে, কাগজের ফর্‌ফর্

শব্দ শুনতে পায় মানু। 'এই তো, ছেচল্লিশ হাজার দুশো…'

'পুরোটা জলে গেল, জাফর।'

'কে বলল?'

মানু দম নিয়ে ঢেকুর তুলল। 'আসল লোকের কাছ থেকেই জানলাম। কালকের পার্টিতে ওল্ড চৌধুরীর সঙ্গে দেখা, বুঝতে পেরেছ?'

'প্রাঞ্জল বাংলা বলছেন, বস্। ডোন্ট ইমপ্লাই দ্যাট আ ডোন্ট নো বেঙ্গলি। চালিয়ে যান।'

মানু আবার দম নেয়, কিন্তু তারপরও দমে যায়। জাফর হাসান খান আজকাল বাড়াবাড়ি রকমের অভদ্রতা করছে। 'ওল্ড চৌধুরী কে জানো কিনা জানতে চাচ্ছি। তোমার বাংলা জ্ঞান নিয়ে কোন প্রশ্ন করিনি।'

'আহ্ বস্। ওল্ড চৌধুরী মানে ওয়ার্কস্ মিনিস্ট্রির সিনিয়র সেকশন অফিসার। চিনব না কেন? সেবার আমিই তো আপনার সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিলাম।'

মানু বড়মতন ঢেকুর তোলে। জাফর যে মাঝে মাঝে ওর ওপর আপারহ্যাণ্ড হয়ে যায়, তার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

'বস্, টেলিফোনের তার বেয়ে হুইস্কির গন্ধ আসছে।'

মানু ধমকের সুরে বলল, 'ইয়ার্কি ভাল লাগছে না, জাফর। আমার দেমাক ভাল নেই। খুলনার কাজটার ব্যাপারে মেয়র সাহেবের সঙ্গে কার কথা বললাম না? তুমিও তো বলেছ! মেয়র বললেন, ফাইল ওয়াকর্স মিনিস্ট্রিতে। চৌধুরীর করাল গ্রাসে পড়েছে। রাতে পার্টিতে দেখা হলো। বললাম। ব্যাটা নাকমুখ সিঁটকে বলল, অন্য একটা ফার্মকে ওয়ার্ক অর্ডার দেয়া হয়েছে।'

'বস্, আপনি কি খুবই আপসেট? কাজকর্মের সেটআপই পালটে ফেলতে চান?'

'তুমি আসলে কী বলতে চাও, জাফর?'

জাফর একটু থেমে বলল, 'প্লেন এণ্ড সিম্পল। কাজটা বাগানোর জন্যে আমরা ছেচল্লিশ হাজার দু'শো ত্রিশ টাকা খরচ করেছি। আর কত টাকা খরচ করতে রাজি আছেন পাবার জন্যে?'

মানুর হেঁচকি বেড়ে গেল। 'তুমি কি···সত্যি···যা বলছ, মিন করছ?'

'ও, ইয়েস?'

'তুমি তো জানো, ওখানে আমরা অন্তত বারো লাখ টাকা প্রফিট করব। আই ডোন্ট মাইণ্ড পে ইভ্ন্ হাফ অভ দ্যাট। ছয় লাখ। বুঝতে পারছ?'

'এক পয়সাও লাগবে না। আপনি শুধু যদি আমার ছোট্ট একটা আবদার রাখেন!'

'এণ্ড হোয়াটস্ দ্যাট?'

জাফর বলল, 'টেলিফোনে বলব না, বস্। অফিসে কখন আসবেন?'

'ইন আফ এন আওয়ার।' টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল মানু। দুটো চেক তার তৃতীয় নয়নে ভেসে বেড়াচ্ছে। একটা বারো লাখ টাকার, অন্যটা ছ'লাখ। জাফর ঠিক কী বোঝাতে চায়?

নাশতা খেলো না মানু। পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেভ আর গোসল সেরে গাড়িতে চাপল। এই দুঃসময়ে গাড়ির সংখ্যা কমে যাওয়া কম দুঃখের নয়। ভাবছিল, আগস্ট মাসের মধ্যে একটা নতুন মডেলের

সিডান কিনবে। হচ্ছে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য তার মনের অবস্থা বদলে যায়। রাস্তায় অসংখ্য লোক ঠেলাঠেলি করে হাঁটছে। এদের শতকরা আশি ভাগ পকেটে বাসভাড়া ছাড়াই রাস্তায় বেরিয়েছে। ওদের দিকে তাকিয়ে গাড়ির মডেল বদলানোর চিন্তাটা ক্রিমিন্‌ল্‌ অ্যাক্টিভিটির মধ্যে পড়ে। তা ছাড়া সেই পুরানো ইংরেজি প্রবাদের কথাও মনে হয়। গোলাপে কাঁটা আছে ভেবে মন খারাপ করার চেয়ে কাঁটাবনে গোলাপ আছে ভেবে খুশি হওয়া যায় না?

আধঘণ্টার কিছু বেশি সময় লাগল মানুর। অস্থির লাগছে। জাফর নিশ্চয় খুলনার কাজের আদেশপত্র জোগাড় করতে পেরেছে। কিংবা জোর কোন আশা পেয়েছে। কিন্তু তার শর্ত কি খুব কঠিন হবে? মানু অনেক সম্ভাবনার জাল বুনল, শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠল নিজের ওপর। একসময় সে লক্ষ করে, অনেকক্ষণ ধরে ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে আছে তার গাড়ি। শুধুই গাড়ি? মনের ভিতরেও কি অমন জ্যাম তৈরি হয়নি?

অফিসের মেইন এন্ট্রান্সে দারোয়ান তাকে দেখে উঠে দাঁড়ায়। অচেনা লোক। আজকাল কন্ট্রাক্টে সিকিউরিটি সার্ভিসের লোক পাওয়া যায়। কিন্তু ঠিক কতটুকু বিশ্বাস করা যায় এই টোটাল্‌ স্ট্রেঞ্জারদের, সে ভেবে পায় না।

লবিতে তাকে স্বাগত জানায় মোরশেদা। হঠাৎ একটা চমকের মত লাগে ব্যাপারটা। মোরশেদা আজই জয়েন করেছে। অ্যাক্সিডেন্টের পর ক'দিন ধরে কেমন যেন ঘোরের মধ্যে ছিল সে। অফিসের লবিতে মোরশেদা চমৎকার একটি সিল্কের শাড়ি পরে খোঁপায় ফুল গুঁজে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে অভ্যর্থনা জানাবে— এটা ক'দিন আগেও সম্পূর্ণ অভাবিত ছিল মানুর কাছে।

মানু অবশ্য হাসল না। গম্ভীর গলায় বলল, 'কী, কেমন লাগছে?'

'ভালই লাগছে, স্যার।'

মোরশেদার মুখে 'স্যার' শব্দও মানুর কানে খাপছাড়া লাগে। কিন্তু উপায় নেই। মোরশেদা অফিসে ওকে 'স্যার' ছাড়া কিছু বলতে পারবে না। নিজের রুমে ঢুকে মানু প্রথমে তোয়ালে টেনে নিয়ে মুখ মোছে। পেছনের পরদা-ঘেরা জায়গাটায় গিয়ে আয়নায় মুখ দেখে। একটু লাল দেখাচ্ছে না মুখটা?

চুলোয় যাক। মানু ডেস্কে বসে পুশ বেল টেপে। পিয়োন উঁকি দেয় সুইং দরজা ঠেলে।

'জাফর সাহেবকে সালাম দাও। আর দু'কাপ চা।'

জাফর এসে বীরের ভঙ্গিতে একটা চেয়ারে বসল। পায়ের ওপর পা তুলে দিল। একটা হাত প্রসারিত করে রাখল দ্বিতীয় চেয়ারের পিঠে। 'কেমন আছেন, বস্? হাই-হাই ভাবটা কেটেছে?'

'হাই-হাই ভাব কেটেছে। এখন খাই-খাই ভাবের মধ্যে আছি।'

জাফর নড়েচড়ে বসল। 'বলেন কি, বস্? নাশতা খাননি?'

'বাড়িতে বউ না থাকলে সময়মত নাশতা জোটা কঠিন, বুঝেছ?'

'বস্, ওই একটি দাবি নিয়েই বসে আছি আপনার খুলনার ওঅর্ক অর্ডার নিয়ে। বউ ছাড়া আমার আর চলছে না।'

মানু গম্ভীর হয়ে বসে থাকবে না হো হো করে হেসে উঠবে ভেবে বার করার আগেই জাফর বলল, 'রাগ করবেন না, বস্। সব নির্ভর করছে আপনার ওপর।'

'কিন্তু···তুমি যদি···আমার রূপসী শ্যালিকার ব্যাপারে ইঙ্গিত করে থাকো···,'

কাট-ইন করল জাফর। 'ইঙ্গিত কি বলছেন, বস্? ও আমার গীত। প্রাণের সঙ্গীত। মনের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করলাম, বস্। সুবিধে হলো না।'

মানু হাসতে চেষ্টা করল। 'ওকে বিয়ে করে···আই মিন··· বিয়ের প্রস্তাব করেও খুব একটা সুবিধে হবে বলে মনে হয় না। বশির বেশ ভালভাবেই মেয়েটাকে গেঁথেছে মনে হচ্ছে। তা ছাড়া···তুমি তো···বেশ ভালই আছ, মিয়া। মোরশেদা তো তোমাকে "প্রাণ-মন-দেহ"···সবকিছুর বিনিময়ে জয় করেছে।'

জাফরের কপালে ভাঁজ পড়ল। অত্যন্ত বিরক্ত দেখাচ্ছে তাকে। 'ওটা একটা বিচ্ছু, বস্। লণ্ডনে বসে মাহফুজ মিয়া টেলিফোন আর পিকচার পোস্ট কার্ড দিয়ে ওর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন চালাক। অসুবিধে নেই। কিন্তু আমার চলবে না।'

খালি পেটে কফি খেতে ভাল লাগে না। তবু একের পর এক চুমুক দিতে লাগল মানু। বলল, 'চেষ্টা করেই দেখো না।'

'বস্, আপনি এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছেন।'

'তুমিও এড়াতে চেষ্টা করো।'

জাফর কিছুক্ষণ ঘাড় গুঁজে বসে রইল। তারপর বলল, 'এড়াতে পারি, কিন্তু খুলনার ওয়ার্ক অর্ডারও আপনার হাত এড়িয়ে যাবে।'

'এটা ব্ল্যাকমেইলিং হয়ে যাচ্ছে, জাফর।'

'ওয়েল, ইচ্ছে করলে ব্যাপারটাকে আপনি ওভাবে নিতে পারেন। কিন্তু আমারও আর কোন উপায় নেই।'

মানু চুপচাপ চায়ে চুমুক দিল। তারপর হাসি ফিরে এল তার মুখে। 'বেশ, আরও একটু সময় দাও আমাকে। একটা চাল আছে, চেলে দেখি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, বস্। জানি, আপনি যাতে হাত দেন, তার শেষ না দেখে ছাড়েন না। ঠিক আছে, অল দ্য বেস্ট লাক।'

হাসপাতাল থেকে রিলিজ নিয়ে ক্লিনিকে ভর্তি হবার পরদিন খুশির পায়ে একটা বিপজ্জনক ইনফেকশন দেখা দিয়েছিল। সময়মত ধরা পড়েছে, তাই রক্ষে। কাল রাতে জ্বরের ঘোরে ভুল বকেছে সে। মানু ছিল না। কথা ছিল, রাতে সে ক্যাবিনে থাকবে। কিন্তু দশটার দিকে 'এক্ষুণি আসছি' বলে সেই যে বেরিয়ে গেল, আর ফেরেনি।

নিশি যখন শুনে যাবার আয়োজন করছে তখন মানুর ফোন পেল। 'সুন্দরী শ্যালিকা, জরুরী একটা কাজে আটকে গেছি। আজ তুমিই তোমার আপার কাছে থাকো। গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। 'ক্লিনিকে পৌঁছে গাড়ি অফিসে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ো।'

'কিন্তু···দুলাভাই···আপা তো···'

মানু কোন কথা শুনতে চাইল না। বাধা দিয়ে বলল, 'তোমার আপা রাগ করবে, জানি। কিন্তু আমি নিরুপায়। বিজনিস। বুঝেছ, গুণবতী শ্যালিকা?'

নিশি বোঝেনি। আভাসে যা মনে হয়েছে, তাকে পাত্তা দিতে চায়নি। কোন লাভও নেই। 'বেশ, যাচ্ছি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, মাই ডিয়ার। সকালে দেখা হবে।'

ভার-ভার মন নিয়ে নিশি গাড়িতে চড়ে। ক্লিনিকে পৌঁছে দেখতে পায়, বশির আর মোরশেদা বেরিয়ে আসছে। মোরশেদার পরনে আগুন-রঙা শাড়ি। তার হাসিতে আরও উত্তপ্ত লালিমার আভাস পাওয়া যায়। বশিরের শরীরে শরীর মিশিয়ে হাঁটছে সে। নিশি মুহূর্তের জন্য বিষম দমে যায়। বশিরের মুখে বিব্রতভাব দেখে

আরও বেশি করে অভিমান জাগে বুকের ভিতরে। কোন গহীন গোপন তলায় আঁচড়ের ব্যথা পায় সে। শেষপর্যন্ত মোরশেদা তার সাম্রাজ্যেও লোভের হাত বাড়িয়েছে।

বশিরের দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকায় নিশি। ঠিক কতটুকু জায়গা বেহাত হয়েছে? ফিরে পাবার সম্ভাবনা আছে কি? কতটুকু লড়াই দরকার হবে তার জন্য? কতটুকু রক্তপাত?

বশির বিব্রতভাব কাটিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার? তুমি হঠাৎ চলে এলে যে!'

মোরশেদা আর দাঁড়াল না। সামনে একটা বেবিট্যাকসি পেয়ে তাতে চেপে বসল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ভিড়ের ভিতর মিলিয়ে গেল বেবিট্যাকসি। নিশি আহত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে কালো ধোঁয়ার দিকে। জীবনটাই কি ওই রকম ধোঁয়া?

নিশি বশিরের দিকে তাকায়। 'আমি হঠাৎ চলে আসাতে তোমাদের···মানে···তোমার কোন অসুবিধে হয়েছে?'

'কী যে বলো!'

নিশি আর কিছু বলল না। ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল। পৌঁছে গেল খুশির ক্যাবিনে।

খুশিও অবাক হয়। 'তোর দুলাভাই কোথায়?'

'অফিসে।'

'এখনও অফিসে!'

নিশি ক্লান্ত স্বরে বলল 'হ্যাঁ। বললেন, জরুরী কাজে আটকা পড়েছেন। আজ আর ক্লিনিকে আসতে পারবেন না। আমাকে অনুরোধ করলেন তোমার কাছে থাকতে।'

খুশি ভার ভার গলায় বলল, 'কী দরকার ছিল?'

নিশি খুশির ওষুধের চার্ট পরীক্ষা করল। 'অ্যান্টিবায়োটিকটা খেয়েছ, আপা?'

'ওষুধ খেতে আর আমার ভাল লাগে না।'

'ছেলেমানুষি কোরো না। নাও, ক্যাপসুলটা খেয়ে নাও।'

খুশি অপ্রসন্ন মনে ওষুধ খেয়ে বাথরুমের দিকে তাকাল। নিশি বলল, 'বাথরুমের যাবে, আপা?'

'হ্যাঁ।'

নিশির কাঁধে ভর দিয়ে খুশি বাথরুমে গেল। বশির এগিয়ে এল নিশির কাছে। ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'রাগ করেছ?'

'না তো!'

'তুমি তো জানো, তোমার বান্ধবীর ধরনটাই অমন।'

নিশি আলতো করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

'আমাকে নিশ্চয় তুমি সন্দেহ করো না!'

নিশি কাঁপা-কাঁপা দৃষ্টিতে বশিরের দিকে তাকাল। 'সন্দেহ আর ভালবাসা কখনও একসঙ্গে বাস করতে পারে না। তোমাকে সন্দেহ করলে আমার আর কী থাকে, বলো?'

বশির আড়চোখে বাথরুমের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিশির ঠোঁটে ঠোঁট রাখল। 'জানি, তুমি আমাকে সন্দেহ করতে পারো না। এবার একটু হাসো তো!'

নিশি একটু দ্বিধার পর হেসে ফেলল। তখনও ওর চোখে অশ্রু চিকচিক করছে। বশির ওকে জড়িয়ে ধরে। বুকের সঙ্গে পিষে ফেলতে ফেলতে মুখ আবার নামিয়ে আনে মুখের কাছে। এমন সময় বাথরুমের দরজায় শব্দ হয়।

বশিরের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে দরজার দিকে ছুটে যায়

নিশি। 'এসো, আপা।'

খুশি তার কাঁধে ভর দিয়ে বিছানায় ফিরে আসে। ধরা গলায় বলে, 'তোদের অনেক কষ্ট দিচ্ছি, নিশি। মনে মনে নিশ্চয় খুব বিরক্ত হচ্ছিস!'

নিশি ধমকের সুরে বলল, 'কী যা-তা বলছ। শুয়ে পড়ো। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।'

খুশি অনেকক্ষণ পর লক্ষ করে, নিশির আঙুলগুলো আর তার চুলের ফাঁকে খেলা করছে না, থেমে আছে। মাথা ঘুরিয়ে বোনের দিকে তাকায় সে। কষ্ট পায় ওর দিকে তাকিয়ে। নিশির চোখ দরজার দিকে ফেরানো। কিন্তু তার দৃষ্টি হারিয়ে গেছে, হয়তো বশিরের সঙ্গেই।

বশির বিদায় নিয়েছে। কিন্তু নিশির মনে হয়েছে, অন্যদিনের মত গভীর আর আন্তরিক সুর ছিল না তার প্রার্থনায়। যেন কতকটা তাড়াতাড়ি পালিয়ে বাঁচতে চাওয়ার মত। মোরশেদা যদি তাকে গ্রাস করেই থাকে, নিশির কিছু করার নেই। বশিরকে ধরে রাখার ক্ষমতা কোথায় তার? সে নীরবে বিদায় মেনে নেবে। কিন্তু তার আগে নৈমিত্তিক বিদায়ে অমন 'পালিয়ে যাওয়া' ভাব করবে কেন সে? নিশি আলতো দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'কী ভাবছিস রে?'

খুশির চুলে নিশির হাত আবার তৎপর হয়ে ওঠে। 'আপা, কিছু খাবে?'

'আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দে।'

নিশি হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু সেটা কান্নার চেয়েও করুণ শোনাল। 'কী আবার ভাবব? ভাবনার কিছু মাথা-মুণ্ডু আছে?'

'মন খারাপ করিসনে। আমি একটু ভাল হয়ে উঠি। তোর বিয়েটা সেরে ফেলব। সত্যি, খামোকা দেরি করে কী হবে?'

নিশির গালে লোনা প্লাবন নামে। খারাপ সময়গুলোতে এমনই হয় ওর। কেউ ওকে নিয়ে একটু ভাবলে, একটু স্নেহ-মাখানো কথা বললে ওর কান্না আসে। বিষম কাঁদতে ইচ্ছে হয়। নিশির সেই সময় খুব ইচ্ছে হলো, গোপন বেদনার কথাটা খুশিকে বলবে। কিন্তু এক সেকেণ্ডের মধ্যে মত পাল্টাল। খুশিকে ভারাক্রান্ত করাটা এখন ঠিক হবে না। একটা বিষয় অবশ্য রহস্যের মত লাগে। মানু আসবে না, রাত-দুপুরে অফিসের কাজের কথা বলে কিসে যেন মেতে আছে। তবু খুশিকে কেমন শান্ত, নির্বিকার দেখাচ্ছে। আগে এমন কিছু ঘটলে সে রাতকে দিন করে ছাড়ত।

ভালবাসা কি তবে এভাবেই একদিন মরে যায়? আগুনের মতই ভালবাসার তেজ কমে যায়? তারপর একদিন নিবে যায়?

পরদিন বিকেলে ক্লিনিকে আসার পথে কাচ-ঢাকা দোকান থেকে কিছু টাটকা ফুল কিনল নিশি। খুশি গত দু'দিন ধরে ফুলের কথা বলছিল। এমন সময় মনে পড়ল, একবার দুলাভাইয়ের অফিসে দরকার। দুপুরে হঠাৎ বাসায় এসে লাঞ্চ করেছে মানু। বেরিয়ে যাবার আগে দুটো ফাইল আর একটা চেক ওর হাতে গছিয়ে দিয়েছে।

'ক্লিনিকে যাবার পথে এগুলো অফিসে পৌঁছে দিয়ো তো, মাই ডিয়ার।'

নিশি হেসে বলেছে, 'ট্র্যাভ্‌লিং অ্যালাউন্স লাগবে।'

'শুধু ট্র্যাভলিং অ্যালাউন্স কেন, ডিয়ারনিস অ্যালাউন্সও পাবে। আগে টুর শেষ করো। তারপর। বিশেষ করে আমি যদি খুশি

হই...'

মানুর বাঁধে চিমটি কেটেছে নিশি। 'আপনি খুশি হবেন কেন? আপনি তো খুশির বর।'

হো হো করে হেসে উঠেছে মানু। 'দারুণ দেখালে, মাই ডিয়ার শ্যালিকা। যাক, জিনিসগুলো বশিরকে পৌঁছে দিতে ভুলো না।'

কোয়াড করপোরেশনের রিসেপশন ডেস্কে মোরশেদার সঙ্গে দেখা হবে— আশা করেছিল নিশি। ডেস্ক ফাঁকা। টেলিফোনে ব্লিপ্ ব্লিপ্ শব্দ হচ্ছে, লাল বাতি জ্বলে উঠছে ঘন ঘন। কেউ অনবরত চেষ্টা করছে পিবিএক্স ধরতে। পারছে না। কিন্তু মোরশেদা কোথায়?

মোরশেদা বেরিয়ে আসছে কোণার দিকের ঘসা-কাচে ঢাকা কামরা থেকে। আগে মানু ওই কামরায় বসত। মানুর জন্য কনফারেন্স রুমের লাগোয়া বড় চেম্বার তৈরি হবার পর থেকে বশির ব্যবহার করে আসছে রুমটা। খুশির পছন্দ-করা গ্রামীণ চেক-এর পরদা এখনও ঝুলছে দরজা-জানালায়। পায়ের কাছে ভেলভেটের পাপোষও আছে। শুধু দরজার ওপরে নেম-বোর্ড বদলানো হয়েছে। সেখানে এখন লেখা আছে: ইরাজ বশির, ডিরেক্টর।

গ্রামীণ চেক প্রবলভাবে দুলে উঠল। তাড়া-খাওয়া প্রাণীর মতই প্রায় ঝাঁপিয়ে বেরিয়ে এল মোরশেদা। তার ঠোঁটে লিপস্টিকের রং বিশ্রীভাবে লেগে আছে চিবুকে আর গালে। কপালে সাপের ডিজাইন-করা টিপ খসে নেমে গেছে ভ্রূর ওপর। বিষম হাঁপাচ্ছে সে।

'নিশি! তুই!'

ভূত দেখার মত চমকে ওঠে মোরশেদা। নিশি তার বুকের

গভীরে গোপনে সেই রক্তপাতের স্মৃতি ফিরে পায়। কিন্তু আশ্চর্য শান্ত দেখায় তাকে।

মোরশেদা ধরা-পড়া গলায় বলল, 'তুই···এমন অসময়ে আসবি, ভাবতে পারিনি।'

'বশির আছে?'

মোরশেদার মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল। 'আছে তো।'

নিশি আর কোন কথা বলল না। নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা এমন কাউকে জানানো ভাল নয়, যে কিনা ওই দুঃখের জন্য সহানুভূতির চেয়ে বেশি করুণা দেখাবে। এমনকি আত্মতুষ্টও হতে পারে। নিশি ঠোঁট চেপে রেখে হাসল, তারপর যেন কিছুই দেখেনি, কিছুই বোঝেনি, এমন একটা ভাব করে বশিরের কামরার দিকে এগিয়ে গেল।

বশিরের মুখ থেকে তখনও হাসি মোছেনি। সন্ধের খানিকটা পরেও যেমন পশ্চিম আকাশে লালিমা লেগে থাকে, বশিরের মুখে তেমনই একটা রং। মিলিয়ে যেতে যেতেও থমকে থেমে আছে।

নিশি তার টেবিলের ওপর ফাইল রাখল। ইচ্ছে করেই শব্দ করল জোরে। চমকে মুখ তুলল বশির। 'আরে! তুমি!'

নিশি বলল, 'এখানে একটা ফাইল আর একটা চেক আছে। অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক। কাল সকালেই জমা দেবার ব্যবস্থা করতে বলেছেন দুলাভাই।'

'দাঁড়িয়ে কেন, নিশি?' বসবে না?'

নিশির রক্তপাত ফিনকিতে রূপ নেয়। মোরশেদার আচরণে তবু একটা ধরা-পড়া, অপরাধী-অপরাধী ভাব আছে। অথচ বশিরের মুখ দেখে কে বলবে, মাত্র কয়েক সেকেণ্ড আগে সে পরকীয়ায়

বিভোর হয়ে ছিল!

এটাকে পরকীয়া বলা যায় কি? নিশি এক মুহূর্ত ভাবতে চেষ্টা করে। মানুষ কোন কমিটমেন্ট সবচেয়ে দামী মনে করে? সমাজকে দেওয়া, না বিশেষ কোন মানুষকে দেওয়া কমিটমেন্ট? তার চেয়ে বড় কথা, যা রাখা যায় না, তাকে কি অঙ্গীকার বলা যায়?

বশির উঠে দাঁড়াল। 'কী হয়েছে, নিশি?'

নিশি হাসতে চেষ্টা করল। 'কী আবার হবে? চলি।'

'এখনই যাবে?'

বশিরের কথায় আগের সেই আবেশ আছে। অন্তত নিশির এই মুহূর্তে তাই মনে হচ্ছে। অবশ্য ওই সুরের কত ভাগ অভিনয়, সে জানে না।

'ক্লিনিকে যাচ্ছি। আপা একা আছে।'

পা বাড়ায় নিশি। বশির ডেস্ক ছেড়ে তার পাশে এসে দাঁড়ায়। 'আজ তোমাকে অন্যরকম লাগছে। তোমার কী হয়েছে, নিশি?'

এই অনাবশ্যক প্রশ্নের উত্তর নিশির জানা নেই।

'ফুলের তোড়াটা—'

বলতে গিয়ে থমকে থেমে যায় বশির। নিশি হাত সরিয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে। 'ওটা তোমার জন্যে নয়।'

এর পরের আঘাত সত্যি মারাত্মক। চার কি পাঁচ দিন পরের এক সন্ধেবেলা নিশি কোয়াড করপোরেশনের গাড়িতে চড়ে ফিরছিল মতিঝিল থেকে। দৈনিক বাংলার মোড়ে পথ আটকে জনসভা করছে একটি রাজনৈতিক দল। ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে কমলাপুর হয়ে আউটার সারকুলার রোডে চলে এল।

শাহজানপুরের কাছে এসে নিশির মনে হলো, একবার মোরশেদার খোঁজ নেওয়া দরকার। সে তিনদিন ধরে অফিসে আসছে না। মানু খুলনা গেছে। অফিসের অন্য কেউ কিছু জানে না। মোরশেদার বাসার সামনে অন্ধকার। প্রথমটায় মনে হলো কেউ নেই। নিশি ফিরে আসবে ভাবছে, এমন সময় দরজা খুলে গেল। বিষম অপরাধী চেহারা নিয়ে বেরিয়ে এল বশির। রাস্তায় বেরিয়ে কোনদিকে না তাকিয়ে বেবিট্যাক্সিতে চেপে বসে সে।

নিশি স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকে মোরশেদার ঘরের দরজার দিকে। গ্রিলে মুখ রেখে মোরশেদা তাকিয়ে আছে বশিরের চলে-যাওয়ার পথের দিকে। এলোমেলো চুল, আরও এলোমেলো তার পরনের কাপড়।

চোখে হাসি। ক্রূর, অস্বাভাবিক তৃপ্তি।

নয়

আবহাওয়ার সঙ্গে মনের অবস্থার বিলক্ষণ একটা সম্পর্ক আছে। কথাটা আগে কখনও মনে হয়নি নিশির। সেদিন দুপুর থেকে আকাশ আঁধার করে এল। নিশির মনের ভিতরে মেঘলা ভাবটা আগের সন্ধেরাত থেকে জমে উঠেছে। সারা সকাল কেটেছে নিজের সঙ্গে

বোঝাপড়া করে। ভেবেছিল, গুমোট কিংবা মেঘলা ভাব— যাই থাক, কেটে যাবে। শুধু পাকাপাকি সিদ্ধান্ত নিতে যা বাকি। কাটানো গেল না। শুধু তাই নয়, সে সভয়ে, সবিস্ময়ে লক্ষ করে, যত সময় যাচ্ছে, মনের ভার সরানো তত কঠিন হয়ে উঠছে।

আকাশে জমে উঠছে মেঘ। মন ভারী হয়ে উঠছে আরও বেশি করে। নিশি আপন মনে পুরানো ডায়েরী আর প্রিয় বইগুলোর পাতা ওলটায়। মাত্র কয়েকটা দিনের মধ্যে তার জীবন বশিরময় হয়ে উঠেছে। সব স্মৃতির সঙ্গে বশির। তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য। উষ্ণ বন্ধুত্ব। ন্যাশনাল পার্কের একটি ঝিকিমিকি জোনাকির রাত তার জীবনটা পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। নিশি বারবার ভাবতে চেষ্টা করে, আবার আগের জীবনে ফিরে যাওয়া যায় না? সে-জীবনে বশির নামে কেউ নেই। তার বিশ্বাসঘাতকতা নেই। মোরশেদা নামের নতুন কোন সমস্যা নেই। তা হলে নিশি আবার স্বপ্ন দেখতে পারত।

সে একজন সঙ্গী খুঁজে নেবে, যাকে নিশ্চিন্তে ভালবাসা যায়। যাকে বিশ্বাস করা যায়। যার জীবনে নিশি ছাড়া অন্য কোন ডাক নেই, সঙ্গ নেই, সান্নিধ্য নেই। নিশি বশিরের ওপর জমিয়ে তোলা সব বিক্ষোভ আর অভিমান নিয়ে ফেটে পড়তে চাইল। সমস্ত স্মৃতির সঞ্চয়ে বারবার আগুন জ্বালাল; পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু আবার এক সময় দেখল, কোন আগুনে তার আকর্ষণ চাপা পড়েনি। সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে সে যেন কখন বশিরের সান্নিধ্যই কামনা করেছে আবার।

এই ব্যর্থতায় সে নিজের ওপর বিষম বিরক্ত হয়। একটু আগে টেলিফোন করেছিল বশির। গলা বুঝতে পেরেই রিসিভার ক্রেডলে নামিয়ে রেখেছে। কী হবে বশিরের ব্যাখ্যা শুনে? ব্যাখ্যা তৈরি করে

নেওয়া কঠিন কিছু নয়। তাতে ওর বুকের আগুন নিভবে কেন? অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর তার মনে হলো, আগুন নেভানোর একটাই উপায় আছে, বশিরের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেওয়া। কীভাবে?

খুশির ক্যাবিনে অনেক পরিত্যক্ত কাপড় জমে গেছে। ধোয়ার জন্য ওগুলো বাসায় আনা দরকার। কিন্তু এই মুহূর্তে নিশি বাসায় ফিরতে চায় না। সেখানে জরুরী মীটিং-এ বসেছেন কোয়াড করপোরেশনের ডিরেক্টর সাহেবরা। হয়তো তাদের হাতে দরকারী ফাইল আর কফির কাপ তুলে দেবার জন্য মোরশেদাও আছে। ওদের কারুর মুখোমুখি হবার ইচ্ছে নেই নিশির।

কিন্তু খুশিকে মনের অবস্থাটা বোঝানো যাচ্ছে না। 'যা না, বোন, কাপড়গুলো বাসায় রেখে আসবি। সন্ধের একটু পরে খাবার নিয়ে চলে আসবি। টালবাহানা করছিস কেন?'

'বাসায় তো···মীটিং চলছে।'

'ওদের মীটিং চলছে তো তোর কী?'

'আচ্ছা, যাচ্ছি।'

খুশি নিশির কাঁধে হাত রাখে। 'তোর খুব পেরেশানি হয়ে যাচ্ছে, না?'

নিশির চোখে বৃষ্টি নামে। লোনা প্লাবনের ঢেউ। খুশি অবাক হয়ে বলল, 'কী রে, কাঁদছিস কেন?'

'আপা, আমার কিছু ভাল লাগে না। মরে যেতে ইচ্ছে করে।'

খুশি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বশিরের সঙ্গে···কোন··· গোলমাল হয়েছে?'

'সব চুকে গেছে, আপা।'

খুশি বিস্ফারিত চোখে নিশির দিকে তাকিয়ে থাকে। 'বলিস কী?'

'হ্যাঁ, আপা। ও-ব্যাপারে আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস কোরো না। বলতে পারব না।'

'তা হলে···যদি সত্যি সেরকম সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকিস···'

'আমি আর বশিরের মুখও দেখতে চাই না। ও একটা প্রতারক। ভণ্ড।'

খুশি নিশিকে শান্ত করার চেষ্টা করল। 'পুরুষমাত্রেই প্রতারক, জানিস? কেউ কম যায় না। বাদ দে ওদের কথা। মন ঠিক কর। তোর জন্যে অন্য পাত্র খুঁজে দেখি। তাড়াতাড়ি তোর বিয়ে দেব।'

'কোন পুরুষকেই তো বিয়ে করতে হবে, আপা। তার চেয়ে থাক ওসব। বিয়ে না করলে কি চলে না?'

খুশি অতি কষ্টে পাশ ফিরে শুয়ে নিশির হাতে হাত রাখে। 'সত্যি চলে না। একসময় আমিও ভাবতাম, বিয়ে না করলে অসুবিধে কী? কিন্তু আমাদের সমাজের রূপ খুব খারাপ।'

নিশি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'এটা বোধহয় আমাদের ভুল ধারণা, আপা। পৃথিবীর সব সমাজেই ভাল আর মন্দ মিলেমিশে আছে। আমাদের সমাজেও। এক এক জনের কাছে এক একটা মন্দ। কিন্তু বিয়ের কথা এখন থাক না।'

খুশি বলল, 'জাফরের কথাটা তুই এখন একবার ভেবে দেখতে পারিস।'

'না, আপা। এখনই ওসব কথা ভাবতে পারছি না।'

খুশি ভয়ে ভয়ে বলল, 'পরে কিন্তু পস্তাবি। জাফরের মত ছেলের জন্যে পাত্রীর অভাব হবে ভাবিস না।'

নিশি বেড ছেড়ে উঠে পড়ল। 'তোমার কাপড়গুলো দাও।'

'চললি নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'রাগ করেছিস আমার ওপর?'

নিশি দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বলল, 'তোমার ওপর রাগ করব কেন?'

'কাপড়গুলো বাস্কেটের ভিতর আছে। নিয়ে যা। কবে যে ইচ্ছেমত উঠে দাঁড়াতে পারব, আল্লাই জানে।'

নিশি বিব্রত হয়। একটু লজ্জাও লাগে। সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ যদি হঠাৎ হ্যাণ্ডিক্যাপ্‌ড্‌ হয়ে যায়, তার অসহায় অবস্থার কথা সবসময় অন্যের মনে থাকে না। নিশি একটা নীল বাস্কেট টেনে বার করল।

'রাতে···কী খাবে, আপা?'

খুশি আজকাল বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলে; সেটা গোপন করার চেষ্টাও বাদ দিয়েছে। 'কী আর খাব? কিছুই ভাল লাগে না। তোর মত আমারও মরে যেতে ইচ্ছে করে।'

নিশি কাপড় গোছানো বন্ধ করে বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস্ করে, 'কেন, আপা? দুলাভাই মানুষটা তো খারাপ না।'

খুশি নিশির কথার সুর ধরার চেষ্টা করে। নিশি কি বিদ্রূপ করছে? অসহায় মানুষের অনেক সমস্যা। তার সব সময়েই মনে হয় অন্যে তাকে উপহাসের চোখে দেখছে, কিংবা করুণা করছে। আত্মাভিমানী মানুষের জন্যে দুটোই সমস্যার।

খুশি অবশ্য নিজেও জানে, মানু নিপাট ভালমানুষ ছিল

একসময়। ভাল থাকতে চেয়ে, খুশিকে ভালভাবে রাখতে চেয়ে ইচ্ছের বিরুদ্ধে খারাপ হতে হয়েছে ওকে। এক সময় সে বলত, 'বিত্তের আসল রহস্য চুরি— যা চিত্তকেও সর্বস্বান্ত করে দেয়।' এখন নিজেই চুরি করে। কখনও অন্যের ধন, কখনও বা নিজেরটাই। কিন্তু চুরি ছাড়া ওর এখন কোন উপায় নেই।

খুশি ছলছল চোখে বলল, 'খারাপ আর ভাল—এই দুটো জিনিসের মধ্যে এত পাতলা পরদা, যে আলাদা করা মুশকিল।'

'তুমি ইচ্ছে করলে, দুলাভাইকে ঠিক পথে রাখতে পারতে।'

খুশি কষ্ট করে হাসল। 'কেউ কাউকে ইচ্ছে করলে ভাল কিংবা মন্দ রাখতে পারে না। আমি চাইলেই কিছু ভাল থাকত না সে।'

'আপা, মানুষের চেষ্টাকে ছোট করে দেখা ঠিক না।'

খুশি ওসব আর ভাবতে চায় না। তাড়াতাড়ি বলল, 'মুরগির সুপ আনিস। আর যদি পারিস, একটা ডিম পোচ।'

নিশি ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে পড়ল। বনানীর বাসায় পৌঁছতে অনেকটা সময় লেগে গেল ট্র্যাফিক জ্যামের জন্য। ভিতরে তুমুল তর্ক-বিতর্ক চলছে। শেয়ার, ডিভিডেণ্ড, ক্যাপিটাল, আর্টিক্‌ল্ অভ্ অ্যাসোসিয়েশন, মেমোর‍্যাণ্ডাম, কন্ট্র্যাক্ট। বিতর্ক ড্রইং রুম ছাড়িয়ে পৌঁছে যাচ্ছে বাইরের ডাইনিং রুম, এমনকি প্যাসিজ-ব্যালকনিতেও। শান্তশিষ্ট এবং সদাশিব গোছের বনিরকে আজ খুবই অসহিষ্ণু আর উত্তপ্ত মনে হচ্ছে। তার স্বর কানে যেতেই নিশির মনে হলো, ওই মেঘস্বরে তার জীবন ঢল নামাতে চেয়েছিল— শ্রাবণের চেয়ে অনেক বেশি। নিশি শুধু ওই ডাকের অপেক্ষায় এতগুলো নিঃসঙ্গ বছর কাটিয়েছে। সে আপন মাধবী বনে ওইরকম একটি ফুল ফোটার অপেক্ষায় ছিল, ভেবেছিল, বসন্ত রাতের চেয়েও মধুর

পূর্ণিমায় ভরিয়ে দেবে। আবার নতুন করে নিশির মুখ লাল হয়ে ওঠে। শরীরের শিরায় শিরায় রক্তের হই-হুল্লোড় শুরু হয়ে যায়।

নিশি যখন বেডরুমের তালা খোলার জন্য চাবি হাতড়াচ্ছে, বশির বেরিয়ে এল ড্রইং রুম থেকে। নিশির কাছাকাছি চলে এল অন্যমনস্কভাবে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

'তুমি!'

নিশি তাকাল না। চাবি খুঁজে পেয়েই দরজা খুলল। পা বাড়াল ভিতরের দিকে।

'নিশি—'

নিশি অস্বাভাবিক শান্ত স্বরে বলল, 'কিছু বলবে?'

'তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল।'

'আমি খুবই ব্যস্ত। তা ছাড়া আমার সঙ্গে কী এমন কথা থাকতে পারে তোমার? যদি সংক্ষেপে বলতে চাও, এখন এখানেই বলতে পারো।'

'তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ।'

'ওই ব্যাপারে আমি কিছু শুনতে চাই না।'

আহত স্বরে বশির বলল, 'তুমি অন্যায়ভাবে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করছ। আমারও কিছু বলার থাকতে পারে। আমি যদি আসামী হই, তবু।'

'আমি তোমাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাইনি। কোন অভিযোগ করিনি।'

'তবু যদি তুমি আমাকে কিছুটা সময় দাও—'

নিশি ওয়ার্ডরোবের দিকে এগিয়ে গেল দ্রুত পায়ে। 'কিছু মনে কোরো না, আমার সময় নেই।'

বশির তার দিকে দু'পা এগিয়ে আসতে চেয়েছিল , এমন সময় এম-ডির গলা শুনতে পেল। 'বশির, দেরি হয়ে যাচ্ছে। তোমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দাও।'

বশির জানে, নিশিকে কাছে পাওয়া এরপর আরও কঠিন হয়ে উঠবে। কিন্তু ওর সিদ্ধান্তটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

'নিশি, শুধু একটা কথা।'

'বলো।'

'তুমি কি আমার ব্যাপারে— মানে আমাদের ব্যাপারে— ফাইনাল ডিসিশান নিয়েছ?'

'হ্যাঁ। আমি একটা ভুল করতে যাচ্ছিলাম। ভাগ্য ভাল, সময় থাকতে শুধরে নিতে পেরেছি। আশা করি তুমিও তাই করবে।'

ধরা গলায় বশির বলল, 'নিষ্ঠুরের মত কথা বলছ।'

নিশি হাসতে চেষ্টা করল। 'সত্যকে অনেক সময় নিষ্ঠুর মনে হয়।'

বশির একথার একটা প্রত্যুত্তর করতে যাচ্ছিল, সুযোগ পেল না। জাফর বেরিয়ে এল ড্রইং রুম থেকে।

'কেমন আছ, নিশি?'

নিশির মুখ হাসিতে ভরে ওঠে। জাফর বেরিয়ে এসে যেন ওকে মস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে— এমন ভঙ্গিতে তাকায়।

জাফর বশিরের উপস্থিতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলল, 'ভাবী কেমন আছেন?'

'পেটে আর কোমরে নতুন একটা ব্যথা দেখা দিয়েছে। খুব সম্ভব ইউরিন ইনফেকশন।'

ড্রইং রুম থেকে মানুর গলা শোনা গেল। 'কী হলো, ডিরেক্টর

সাহেবগণ?'

জাফর বশিরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'তুমি যাও। নিশির সঙ্গে কথা শেষ করেই আমি যাচ্ছি।'

বশির ঘুরে দাঁড়াল। প্রায় টলোমলো পায়ে চলে গেল ড্রইং রুমের দিকে। নিশির হঠাৎ মন খারাপ হয়ে যায়। কান্না ছুটে এসে গলায় আটকায়।

'নিশি, সন্ধের পর তোমাকে চাইনিজ খাওয়ার দাওয়াত দিতে চাই।'

নিশি তাড়াতাড়ি বলল, 'আমার মনটা ভাল নেই, জাফর ভাই।'

'তোমার মনটা ভাল করার জন্যেই বলছি।'

'তা ছাড়া···আপার জন্যে খাবার আর কাপড়চোপড় নিয়ে যেতে হবে। আজ আমাকে মাফ করে দিন।'

মানু অনেকক্ষণ ধরে ফাইলগুলো খুঁটিয়ে দেখল। জাফর একটানা অনেকক্ষণ বকবক করেছে কোম্পানির শেয়ার আর বর্তমান ব্যবসায়িক অবস্থা নিয়ে। বশিরকে কিছু প্রশ্ন করা হয়েছিল। বশির সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি। তার জানা নেই, এসব প্রশ্নের কোন উত্তরে বোর্ড অভ ডিরেক্টরস সন্তুষ্ট হবে।

শেষ পর্যন্ত চারদিকের চাপে বশির এমন কোণঠাসা হয়ে পড়ল যে ওকে নিজের মুখেই পরাজয় স্বীকার করতে হলো।

'বুঝতে পারছি, কোম্পানি থেকে যদি আমি নিজের অংশ উইথড্র করি, সব সমস্যারই সমাধান হয়।'

বশিরের হঠাৎ আত্মসমর্পণের জন্য ওরা কেউ তৈরি ছিল না। সভায় ছোটখাট একটা চমকের কাজ করল বশিরের ঘোষণা।

মানু তাড়াতাড়ি বলল, 'আমরা ঠিক তা বোঝাতে চাইনি।'

বশির বলল, 'কিন্তু আপনাদের সব আলোচনার সারাংশ একত্র করলে এই দাঁড়ায় যে আপনারা প্রায় তাই চেয়েছেন। নিজেরা কেউ প্রস্তাব করতে চাননি, তাই আমার মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন।'

জাফর হাসল। 'মাই ডিয়ার ইনটেলিজেন্ট ফ্রেণ্ড, তুমি নিশ্চয় এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব সাজেস্ট করতে পারো।' আমাদের লক্ষ্য কোম্পানির বেনিফিট। গ্রহণযোগ্য হলে তোমার প্রস্তাবই আমরা মেনে নেব।'

বশির আলোচনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। হঠাৎ সব কিছু শূন্য মনে হচ্ছে তার কাছে। পরাজয় নিশ্চিত জেনেও যুদ্ধ করার কী মানে হয়? মানু অবশ্য আর কোন প্রস্তাবের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাল না।

আধঘণ্টার মধ্যেই হিসেব নিকেশ শেষ হলো। কোম্পানির কাছে বশিরের খুব বেশি দাবি নেই। তবু মানু আর জাফর—দু'জনেই উদার হতে চেষ্টা করল। বশির কোয়াড করপোরেশন থেকে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। চূড়ান্ত অপমানের আগে এ বরং ভালই হলো, বশিরের সান্ত্বনা এই একটাই।

একদিন কোয়াড করপোরেশনে তার প্রয়োজন ছিল। সে নিজেও কোম্পানির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে প্রাণপণে কাজ করেছে, সেবা দিয়েছে। এখন আর তার সে-সেবার দরকার নেই। কোম্পানি তাকে অপ্রয়োজনীয় বোঝা মনে করে

শেষ মুহূর্তে মানু খুবই দুর্বল হয়ে পড়ল। 'নীতিগতভাবে আমরা সবাই তো একমত হয়েছি। ঝামেলা বাধার আগে শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি নিশ্চয় সবাই চায়। কিন্তু আমি বলতে চেয়েছিলাম, আজই সব শেষ না করলে চলে না?'

বশির রাজি হলো না

মানু বলল, 'তুমি নিশ্চয় আমাদের ওপর কোন অভিমান...'

অনেকক্ষণ পর হাসল বশির। 'অভিমান হবে কেন? বিজনিস ইজ বিজনিস। এখানে লাভ-ক্ষতির অঙ্কই বড়। সিলি সেন্টিমেন্ট দিয়ে তো আর ব্যবসা হয় না!'

'দ্যাটস্ রাইট তোমার স্পিরিটকে আমরা সবসময় শ্রদ্ধা করেছি, বশির। আশা করি নিজের ব্যবসায় তুমি আরও ভাল করবে।'

নিশি যখন খুশির জন্য টিফিন ক্যারিয়ার আর কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে গাড়িতে উঠছে, তখন রাত ন'টার কম নয়। বনানীর রাস্তাঘাট জনশূন্য। মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা ভাঙছে দু'একটা গাড়ি। রাস্তা আর বাড়িগুলোর দেয়ালে তুমুল দাপাদাপি করছে আলো, তারপর আবার স্বস্তি নেমে আসছে। মন-কেমন-করা আলো-অন্ধকারের খেলা চলছে রাতের আকাশে। এক কোণে বোকার মত ঝুলছে শীর্ণ চাঁদ।

বশির দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ওপারে। কেন দাঁড়িয়ে আছে সে জানে না। শুধু জানে, একটু আগে একবার খবর পেয়েছিল, নিশি ক্লিনিকে যাবে। শুধু নিশিকে এক পলক দেখার জন্য সে অপেক্ষা করছে?

নিশি মোরশেদা আর তাকে ঘিরে মনে মনে একটি কাহিনী রচনা করেছে, বশিরের সন্দেহ নেই। ওই কাহিনী কতটা মিথ্যে, কতটা অসার, নিশিকে জানানো দরকার ছিল। তারপরও যদি নিশি তার জীবন থেকে সরে দাঁড়াতে চায়, বশিরের কিছু করার নেই। কিন্তু তাকে কোন সুযোগ দিতে রাজি নয়।

কোয়াড করপোরেশনের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেছে। এই বাড়িতে হয়তো আর কখনও আসা হবে না। নিশির সঙ্গে জীবনের যে-অধ্যায় বিষম জড়িয়ে গিয়েছিল, তারও ইতি ঘটতে যাচ্ছে। তবু বশির কেন দাঁড়িয়ে আছে?

আজও নিশির হাতে একগোছা ফুল। ওই ফুল বশিরের নয়। সেদিনও তার হাতে ফুলের তোড়া ছিল। বশিরের নাকে তার ঘ্রাণ পৌঁছেছে। ভীষণ অন্তর্দাহে ছটফট করেছে বশির। ফুল তাকে দেয়নি নিশি।

নিশির জীবনের ফুল, যৌবনের স্বপ্ন— সবকিছু অন্য কারুর জন্য। বশিরের কিছু করার নেই। মানু শুভকামনা জানিয়ে একটু আগেই বলেছে, একা ব্যবসায় নেমে বশির যথেষ্ট উন্নতি করবে। ননসেন্স! বশিরের সব আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা ভেঙে গেছে স্বপ্নের মত।

নিশি একবার অবহেলা ভরে তাকাল বশিরের দিকে। বশির একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়েছে। সেই ধোঁয়ায় নিশির মুখ অস্পষ্ট হয়ে উঠল। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। নিশি মুখ ঘুরিয়ে সামনে তাকিয়ে আছে। হয়তো সামনের নতুন জীবন, নতুন স্বপ্ন তাকে ডাকছে। সেখানে বশির নামে কেউ নেই। তার স্মৃতিটুকুও নেই।

বশির ফুটপাথে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল। কতক্ষণ, সে জানে না।

দশ

সকাল থেকে চারদিক অন্ধকার করে বৃষ্টি হচ্ছে। খুশি তার বেডে আধশোয়া হয়ে বৃষ্টি দেখছে। অনেকদিন বৃষ্টি দেখা হয় না। মহানগরের জীবন তার নিজস্ব ঔজ্জ্বল্যে এমন বিভোর থাকে যে প্রকৃতির অনেক সুন্দর দৃশ্য আর ঘটনা আড়ালে চাপা পড়ে যায়। কীভাবে রোদ আর ছায়া খেলে যায়, কবে বর্ষা আসে, কখন দরজায় টোকা দেয় বসন্ত, এ-জীবনে তার বিশেষ পাত্তা থাকে না। এ-জীবনের তুমুল ব্যস্ততার ভিড়ে জোছনা মুখ দেখানোর জায়গা পায় না, তারারাও এড়িয়ে যায়।

খুশি তার নিজের জীবন নিয়ে আজকাল খুবই বিব্রত। সে কাউকে নিজের দুঃখকষ্টের ভাগ দিতে চায় না, কাউকেই ভারাক্রান্ত করতে চায় না। কিন্তু ভাগ্য বলে এক শত্রু মানুষের সঙ্গে মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর তামাশায় মেতে ওঠে। তাকে মেনে না নিয়ে খুশির উপায় নেই। নিশি যথেষ্ট কষ্ট করছে তার জন্য। মানুও।

আজকাল নতুন সব প্রজেক্ট নিয়ে বিষম ব্যস্ত থাকে সে। তিনটে নতুন প্রকল্পের কাজ চলছে। একটি কাজ শেষ হবার পথে, এখনও দু'টি বাকি। সংসারে বেশ কিছুটা বাড়তি সময় দিতে হয় তাকে।

আগে যেসব বিষয় খুশি সামলে নিত, তার কিছুটার ভার নিশির ওপর পড়েছে। নিশি বিনা প্রতিবাদে, বরং বলা যায়, হাসিমুখে সেসব দায়িত্ব পালন করে। তবু সংসার— বিশেষ করে ধনী কিংবা উচ্চবিত্ত পরিবারে কিছু বাড়তি সমস্যা থাকে, যেগুলো মেটানো নিশির পক্ষে সম্ভব নয়। মানুকে সে সব দেখতে হয়।

এরপর মানুর আসল দায়িত্ব বাকি থাকে। ক্লিনিকে প্রত্যেকদিন অন্তত দু'বার উপস্থিত হয় সে। ওষুধ-পত্রের খোঁজখবর নেয়। খাবার-টাবারের ব্যবস্থা করে। খুশির মন আজকাল প্রায়ই খারাপ থাকে। বিষম কান্নাকাটি করে সে। মানু পরম ধৈর্যে সেবা করে তার। খুশি মাঝে মাঝে কৃতজ্ঞতায় ছোট হয়ে যায়, কখনও ভাবতে শুরু করে, লোকটা কোথায় পেল এত ধৈর্য!

নিশির আসার কথা সকাল ন'টার মধ্যে। খুশি এরই মধ্যে অন্তত দশবার ঘড়ি দেখেছে। প্রায় এগারোটা বাজে। নিশি কেন আসছে না? পথে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি তো? যদি ঘটে, কী হবে, ভাবার ক্ষমতা হারিয়ে কাঁদতে শুরু করে খুশি। অথবা···খুশির কথা ভুলে গেছে সে! অন্য কোন বিষয়ে মেতে আছে! জাফরের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেলে মন্দ হয় না। কিন্তু খুশি স্বার্থপরের মত ভাবে, আগে তো বোনের সুখ-সুবিধার দিকটা দেখবে সে!

রাস্তার ওপারে একটা লোক দাঁড়িয়ে ভিজছে। বৃষ্টির জন্য ভালভাবে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু খুশির সন্দেহ নেই, তার পরনে ভাল কাপড়চোপড় আছে। এমন একজন লোক ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ভিজছে— বেখাপ্পা লাগে ব্যাপারটা। হাঁটার ক্ষমতা থাকলে খুশি নিশ্চয় একটা ছাতা নিয়ে রাস্তা পার হয়ে তার কাছে চলে যেত। জিজ্ঞেস করত, কেন ওখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তারপর সে

একসময় ভাবে, ওগুলো তার কর্মহীন মনের এলোমেলো ভাবনা। সুস্থ থাকলে সে লোকটার কথা ভাবার ফুরসত পেত না। তার কাছে গিয়ে খোঁজখবর নেবার প্রশ্নই ওঠে না। খুশি একটা উপন্যাস টেনে নেয় টেবিল থেকে। দু'পাতা পড়ে মুড়ে রেখে দেয়। ভাল লাগছে না। উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের সুখ-দুঃখের বিষয়গুলো হাস্যকর আর কাল্পনিক মনে হচ্ছে। হয়তো প্রত্যেক মানুষের কাছেই নিজের জীবনের আনন্দ-বেদনাই বড়। তার সঙ্গে মিলে গেলে তবেই উপন্যাসের সঙ্গে একাত্ম হয় মানুষ।

পরদা দুলে উঠল। মানু। তার হাতে ব্যাগ। টিফিন ক্যারিয়ার। বই-পত্রিকা। বেডের পাশে টিফিন ক্যারিয়ার রেখে খুশির কাঁধে হাত রাখল মানু।

'কেমন আছ, খুশিয়া বেগম?'

খুশি মানুর চোখে চোখ রাখে। মানুর চোখের দৃষ্টি কি আগের মতই আছে? একটুও বদলায়নি? খুশি কি অকারণ দুঃশ্চিন্তায় ভোগে? বড় খোঁড়া হয়ে বিছানায় পড়ে আছে, দু'মাস হলো। তিনটে সার্জারি হয়েছে, ভাল হবার যথেষ্ট লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না। মানুর মত বিত্তবান, স্বাস্থ্যবান, ম্যানিজিং ম্যান এখনও বউয়ের অপেক্ষায় নিঃসঙ্গ প্রহর গুণছে? কতটুকু বিশ্বাস করা যায়? ঠিক কতটুকু?

মানু খুশির উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে ফাইল খুলে সর্বশেষ রিপোর্টগুলো পড়তে শুরু করে। তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টির প্রমাণ। মাথা থেকে গড়িয়ে পড়ছে ছোট ছোট ধারা। কিন্তু সেসব বিষয়ে তার কোন উদ্বেগ আছে বলে মনে হয় না। রিপোর্ট পড়া হলে সে ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'নাও, নাশতা খেয়ে নাও। অনেক দেরি হয়ে গেছে আজ।'

খুশি জিজ্ঞেস করল, 'নিশি এল না?'

মানু হাসল। টিফিন ক্যারিয়ার থেকে পাউরুটি-মাখন, ডিম পোচ, আপেল আর ফিরনি বার করে প্লেটে সাজাতে সাজাতে বলল, 'আমি এসেছি, তুমি খুশি হওনি?'

'তোমার কেবলই উলটা-পালটা প্রশ্ন। খুশি হব না কেন? তবে নিশির আসার কথা ছিল। কেন এল না, জিজ্ঞেস করব না?'

'একশোবার জিজ্ঞেস করবে, খুশিয়া বেগম। আমাদের গাড়িটা ট্রাবল দিচ্ছে। এই প্রচণ্ড বৃষ্টির ভিতর নিশিকে রিকশায় আসতে বলি কীভাবে? তাই নিজেই চলে এলাম। নাও, হাঁ করো।'

খুশি নাশতা মুখে পুরল। মানুর ওপর নির্ভরতার একটা অভ্যেস আছে তার। নির্ভর না করে পারে না সে। সেই সঙ্গে মানুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও তার জানা। পদস্খলন হলেও মানু আছাড় খাবে না, নিজেকে সামলে নেবে। মানুর এই ক্ষমতা খুশির বুকে যেমন সাহস যোগায়, তেমনি ভাবনায় ফেলে।

'একটা কথা বলব?'

'নিশ্চয় বলবে।'

'আমাকে ছেড়ে থাকার অভ্যেস তো তোমার নেই। কী করে আছ?'

মানু চট করে উত্তর দেয় না। সে বোঝে, তড়িঘড়ি করে উত্তর দিলে তাতে কিছু গোলমাল থাকবেই। সে একটু সময় নিয়ে বলে,'কাজকর্মের চাপ বেড়েছে। ঘর-সংসার দেখতে হয়। দায়িত্ব মাথার ওপর যত বেশি থাকবে, আজেবাজে ধান্দা করার সময় ততই নাগালের বাইরে চলে যাবে, জানোই তো!'

খুশি আপেলে কামড় দিয়ে বলল, 'আজেবাজে ধান্দার কথা বলিনি। জানতে চেয়েছি, একা কী করে কাটাও। আমার কথা তোমার মনে পড়ে?'

'মনে যে পড়ে, তার প্রমাণ তো পাচ্ছ!'

খুশি হাসল। 'প্রমাণ বেশি পাচ্ছি বলেই ভয় হয়।'

'কিসের ভয়?'

খুশি একটু ভাবল। মানুর কাছ থেকেই এই কৌশল আয়ত্ত করেছে সে। সব প্রশ্নের উত্তর তাড়াতাড়ি দেয় না। মানুর এবারের প্রশ্নটাও সে এড়িয়ে গেল। সত্যিকার উত্তর না দিয়ে বলল, 'কিসের আবার? চিরদিন যদি তোমার এত সজাগ দৃষ্টি না থাকে,তখন চলবে কীভাবে?'

মানু বলল, 'মানুষ তো চিরদিন বাঁচে না। তা হলে আর জীবনের এই ক'টা দিনের জন্যে এত অস্থির হয় কেন? কারণ, সে যতদিন বাঁচবে, ভালভাবে থাকতে চায়।'

খুশি বলল, 'নিশির ব্যাপারে কী ভাবছ?'

'ভাবাভাবির কী আছে? জাফর তো ওকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। তোমার বোনের মতিগতি তো বোঝা যায় না।'

'আমার মনে হয়, এই মুহূর্তে জোর-জবরদস্তি না করাই ভাল। আমি একটু সুস্থ হয়ে উঠি, তারপর দেখব, কী করা যায়।'

'জোর-জবরদস্তি? একটুও না। আমি ওসবের মধ্যে নেই, খুশিয়া বেগম। কার জন্যে জোর করব? কেনই বা করব? জাফর আমার সঙ্গে ব্যবসা করে নিজের স্বার্থেই। আমারও ওকে দরকার, কিন্তু আমার স্বার্থ তো একতরফা নয়! বিয়েটা হয়ে গেলে

পার্টনারশিপের ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারতাম আর হয়তো বাড়তি কিছু ইনভেস্ট করতে পারতাম! এই তো!'

খুশি মানুর চুলে হাত বুলিয়ে বলল, 'ক'টা দিন অপেক্ষা করো, লক্ষ্মীটি। দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মানু অপ্রসন্ন স্বরে বলল, 'ঠিক আছে। তুমি যখন বলছ!'

খুশির মন ভাল হয়ে যায়। খাওয়া শেষ করে সে জানালার পরদা সরিয়ে বাইরে তাকায়।

'কী দেখছ অত মন দিয়ে?'

খুশি হাসল। বৃষ্টি কমে এসেছে। বাইরের সেই লোক নেই। ফুটপাথ শূন্য। কেন যেন খুশির মনে হচ্ছিল, লোকটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

খুশি বলল, 'জানো, একটা লোক ওইখানে দাঁড়িয়ে ভিজছিল। প্যান্ট-শার্ট পরা, ভদ্রলোক। তখন খুব জোর বৃষ্টি। চেহারাটা চেনা যাচ্ছিল না।'

মানুর কপালে একটা ভাঁজ পড়ল। ক্রমেই ভাঁজের সংখ্যা বাড়তে লাগল। 'কোনখানে দাঁড়িয়ে ছিল?'

'ওই তো···রাস্তার ঠিক ওপাশে। ফুটপাথে।'

'কালো প্যান্ট, সাদা শার্ট?'

খুশির কপালেও এবার ভাঁজ দেখা দেয়। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি দেখেছ?'

মানু বলল, 'ওইখানে কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখিনি,তবে আমি যখন রিকশা থেকে নামলাম, একজন ভিজতে ভিজতে হাঁটছিল, এয়ারপোর্ট রোডের দিকে চলে গেল। আমাকে দেখতে পেয়েছে কি না বুঝতে পারলাম না।'

'তোমাকে দেখতে পেয়েছে— মানে! তুমি চেনো নাকি?'
মানু কথা না বলে মাথা নাড়ল।
'কে সে?'
'ইয়ে···বশির।'

বশির হাঁটতে বেরিয়েছিল ভোরবেলায়। দিনটাকে অন্যরকম মনে হচ্ছে। আজ তার হাতে কাজ নেই। কোন কাজের চিন্তাও নেই। সত্যিকার ছুটি যাকে বলে। কাল সে দিলখুশায় এক বন্ধুর অফিসে গিয়েছিল। বন্ধুটি নিউজিল্যাণ্ডের এক ইমিগ্রেশন কনসালটেশন ফার্মের এজেন্ট। বশির দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে চায় শুনে প্রথমে খুব অবাক হলো, তারপর বিস্তর উপদেশ বিতরণ করল।

তাতে অবশ্য বিশেষ কাজ হলো না। বশির যখন বলল, যে-কোন মূল্যে, যে-কোন ফার্মের সাহায্য নিয়ে বিদেশে পাড়ি জমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বন্ধুটি ফাইল আর ক্যালকুলেটিং মেশিন টেনে নিয়ে বসল।

সে জানাল, নিউজিল্যাণ্ডের ক্রাইস্টচার্চ শহরে বশিরের জন্য উপযুক্ত একটি কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। এটা কোন সমস্যা নয়, তবে খরচ একটু বেশি পড়বে।

বশির খরচের জন্য ভাবছে না। সে খুব তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানাল বন্ধুটিকে। বন্ধুটি সবজান্তার হাসি দিয়ে বোঝাল, সব কিছু চাইলেই তাড়াতাড়ি হয় না। কোন কোন কাজে সময় লাগবেই। তবে সে চেষ্টা করবে যতটা সম্ভব শিগগির ঝামেলাটা মিটিয়ে দেওয়া যায়।

তখনই তিনটে ফরম পূরণ করতে হলো বশিরকে। ফটো আর এক গাদা সার্টিফিকেট টেস্টিমনিয়াল অ্যাটেস্ট করিয়ে জমা দিতে হলো। ব্যাঙ্কে গিয়ে ফার্মের নামে পে অর্ডার করিয়ে আনতে হলো। ওইদিন রাতে টেলিফোন করে বন্ধুটি জানিয়ে দিল, মাসখানেকের মধ্যেই প্লেনে চেপে উড়াল দিতে পারবে বশির।

অনেকদিন পর রাতটা ঘুমিয়ে কাটিয়েছে সে। ভোরবেলা উঠে দেখল, শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। আকাশে বিরামহীন মেঘের আনাগোনা। কাল রাত থেকেই গুরু গর্জন দিয়ে নোটিশ সার্ভ করছে আকাশ: আজ বৃষ্টি হতে পারে। তবু কালো সার্জের দামী প্যান্ট আর সাদা ইজিপশিয়ান কটনের শার্ট পরে বেরিয়ে পড়ল বশির। আজ সে লক্ষ্যহীন, পরিকল্পনাহীন ভাবে হাঁটবে। যখন ইচ্ছে করবে, বাসায় ফিরে আসবে। ইচ্ছে না হলে ফিরবে না। কোন হোটেলে খাওয়াটা সেরে নেবে। আজ সে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করবে।

একবার সে আকাশের দিকে তাকায়। বৃষ্টি আসতে পারে যে-কোন সময়ে। তা আসুক না। ভিজলে কার কী ক্ষতি? সার্জের প্যান্টটার ক্ষতি করতে না চাইলে সে পথের পাশে কোন বাড়ির গাড়িবারান্দায় আশ্রয় নিতে পারে।

বশির মুক্ত, স্বাধীন প্রাণীর মত হেঁটে বেড়াতে চেয়েছিল, কিন্তু কোন ঘোরের মধ্যে কখন যে গুলশান লেকের পাড়ে হাসি মুখে তাকিয়ে থাকা ক্লিনিকের কাছে এসে পৌঁছেছে, সে জানে না। কিন্তু ক্লিনিকের দিকে তাকিয়ে তার মুখের হাসি-খুশি ভাবটা মিলিয়ে গেল।

কবজি উলটে সময় দেখল বশির। পৌনে ন'টা। একটু পরেই নিশি আসবে। নিশির সময়জ্ঞান খুব প্রখর। কখনও তার ব্যত্যয় হয়

না। নিশিকে একবার, একপলক দেখার জন্য বশির তার অন্তর্গত রক্তে প্রবল আকাঙ্ক্ষা আবিষ্কার করে। তার নিশি, তার নিশির ডাক রক্ত-মাংসের মানবী হয়ে এখান দিয়ে এসে ঢুকবে।

বশিরের হাঁটার ক্ষমতা লোপ পায়। থমকে দাঁড়ায় ফুটপাথের ওপর। সেই স্বপ্নের রাজকন্যা এখনই আসবে এখানে। তেলাকুচো ফলের মত সেই লাল টুকটুকে ওষ্ঠ, সেই উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ চোখ, ঐশ্বর্যময় কেশরাশি আর গুরু নিতম্বের দ্রুতগামিনী সেই অধরা মাধুরী— চাঁদের মত উদয় হবে রাস্তার পারের ওই দিগন্তে।

নিশির ক্লিনিকে আসার সময়সূচী কি তবে আগেই বশিরের তাতানো হৃদয়ে আকুলিবিকুলি করছিল? ওপরে ওপরে মুক্ত দিন যাপনের নামে অবচেতন মন ঠিকমতই চলে এসেছে ক্লিনিকের কাছে। এ তো একধরনের বন্দীদশা! অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। বশির নিজের ভাগ্যের হাতে নিজের বন্দীত্ব টের পেয়েও মুক্তির চেষ্টা করল না। দাঁড়িয়ে থাকল ফুটপাথের ওপর।

কিন্তু কতক্ষণ? বাইরে ওদের গাড়িটি নেই। তার মানে, নিশি এখনও আসেনি। আসার কথাও নয়। কিন্তু রোগিণীর নাশতা আনার কথাও কি ওদের মনে নেই? মোরশেদা আর মানুর ঘনিষ্ঠতাকে কেন্দ্র করে অনেক খণ্ডদৃশ্য পলকে পলকে বশিরের তৃতীয় নয়নে ভেসে ওঠে। আবার মিলিয়ে যায়। আবার ভেসে ওঠে।

অস্থির পায়ে সে একসময় ক্লিনিকে ঢুকে অ্যাটেনডেন্টদের কাছ থেকে খুশি আর তার বাসার লোকজনের আসা-যাওয়া সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়। না, তার ধারণায় ভুল নেই। আসেনি নিশি। তার মানে নিশ্চয়ই আসবে।

এরই মধ্যে একসময় বৃষ্টি নামল। প্রথমে ফোঁটায় ফোঁটায়,

তারপর মুষলধারে। কী করতে পারে বশির? একটি মায়াবী নারীমূর্তি— যে এখনও ওখানে উপস্থিত হয়নি, তার আসার সম্ভাবনাই ওকে ল্যাম্প পোস্টের মত দাঁড় করিয়ে রেখেছে ফুটপাথের ওপর। পাগলামি হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা, বশির বোঝে। কিন্তু এও বোঝে যে তার করার কিছু নেই। বিদেশে পাড়ি জমানোর সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। আরও খবর পেয়েছে বশির, যে-কোনদিন ক্লিনিক থেকে ছাড়া পাবে খুশি। নিশি এই জায়গায় আর কখনও আসবে না। কে জানে, হয়তো আজই শেষ দেখা।

বশির ভিতরে ভিতরে ছটফট করে উঠল। একটি সামান্যা তরুণীকে দূর থেকে মাত্র একবার দেখার জন্য প্রবল বৃষ্টির ভিতর রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে সে। এভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে মানুষ? অসময়ের বৃষ্টি। রাজ্যের দূষিত বাষ্প মিশে আছে এর সঙ্গে। ইনফেকশনসুদ্ধ ঠাণ্ডা লেগে যেতে কতক্ষণ?

দুটো ঘণ্টা পার হয়ে গেল ঘোরের মধ্যে। নিশির দেখা নেই। বৃষ্টির মধ্যেও কয়েকটা গাড়ি এসে ক্লিনিকের ভিতর ঢুকেছে। কয়েকটা রিকশাও এসেছে। কিন্তু নিশির খবর নেই। শেষ পর্যন্ত একটা রিকশা এসে গেটে দাঁড়াল। বশির দূর থেকেই মানুকে চিনতে পারে। মানুর হাতে ব্যাগ, টিফিন ক্যারিয়ার। তার মানে নিশির আসার আর কোন সম্ভাবনা নেই।

বশিরের বুকের ভিতরটা অচেনা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায়। মনে মনে নিশিকে সে বিদায় জানায়। হয়তো ভালই হয়েছে। নিশি তার এই অসহায়, হৃতসর্বস্ব, পলাতক মুখ দেখে করুণা করার সুযোগ পেল না। শুধু করুণা? তার সঙ্গে হয়তো জুটত উপহাস। থাক। নিশির মনে তার যে-ছবি আঁকা আছে, তাই থাক।

দ্রুত পা বাড়াল বশির। মানু একবার তাকাল। বশির মুখ ঘুরিয়ে নিল। পুরানো সম্পর্কের রেশ ধরে দুঃখ নিয়ে টানাটানি করার কোন মানে হয় না। হাঁটতে হাঁটতে এয়ারপোর্ট রোডে চলে এল বশির।

মানু চলে যাবার পর খুশি বিছানায় শরীর এলিয়ে দেয়। নিশি কাছে নেই, ভালই হয়েছে। বশির যে ওর সঙ্গে দেখা করতে, কিংবা অন্তত দূর থেকে একবার দেখতেই এসেছিল, তাতে সন্দেহের কারণ নেই। নিশি কীভাবে নিত এই ব্যাপারটা? দুঃখ পেত? যন্ত্রণায় বিদ্ধ হতে হতে প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই ছুটে যেত ওর কাছে? বলা মুশকিল। কিন্তু সে এখানে নেই এবং বশিরের এই উন্মত্ত আবেগের সর্বশেষ প্রমাণ পেল না— এটা বেশ স্বস্তি দিল খুশিকে।

ভালবাসা আসলে ভাল নয়। খুব কষ্টের। খুব যন্ত্রণার ব্যাপার। খুশি নিজে এই কষ্টে ভুগছে। মানুকে ভাল না বাসলে তার কোন কষ্ট হত না। চুনী ভাবীর এই যন্ত্রণা নেই, দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছেন মহিলা। আশরাফ ভাইয়ের সঙ্গে তার অন্য যে-সম্পর্কের বন্ধনই থাক না কেন, ভালবাসা নেই। তবে তাদের মধ্যে আছে ভালবাসার ভান। সমাজে, বন্ধুবান্ধব কিংবা আত্মীয় মহলে তারা দু'জনেই ভালবাসার যথেষ্ট নমুনা প্রদর্শন করেন। খুশি জানে, সেসব মেকি। স্ট্রেট ধাপ্পা।

চুনী ভাবীর একটা কথা মনে পড়লে খুশি হাসি সামলাতে পারে না। একবার ওরা দু'জনেই এলেন খুশির বাসায়। কিন্তু কারুর মুখে কথা নেই। মুখটুখ লাল। আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুশি জিজ্ঞেস করেছে, 'কী খবর, ভাবী? ভাবসাব ভাল নয় মনে হচ্ছে!'

চুনী ভাবী খুশির গাল টিপে দিয়ে বলেছেন, 'যা বলেছ, ননদিনী। সাহেবের মনমেজাজ খুব খারাপ।'

'কেন গো?'

'দু'দিন ধরে দু'তরফে নন কোঅপারেশন চলছে।'

'কার কী অপরাধ?'

চুনী ভাবী অনেকক্ষণ হেসে বলেছেন, 'তোমাকে সত্যি ব্যাপারটা বলি। আমি যেদিন বাইরের পুরুষদের সান্নিধ্যে অনেকটা সময় কাটাই, সেদিন তোমার ভাইকে খুব অসহ্য লাগে। ওর সঙ্গ সহ্য করতে পারি না। এটা ঠিক হতে কয়েকদিন সময় নেয়। তারপর আবার সব ঠিক হয়ে যায়। কী করব, বলো? মনের ওপর তো জোর চলে না।'

খুশি স্তম্ভিত হয়ে বলল, 'তবে যে ভারি দু'জনে কপোত-কপোতীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছ!'

'এটা তো প্রয়োজনের ভালবাসা, ভাই।'

এগারো

ক্যাবিনে টেলিফোন নেই। বাসা কিংবা অফিস থেকে কখনও জরুরী দরকারে কল করে মানু। ক্যাবিনগুলোর কোণার দিকে নার্সদের রিটায়ারিং রুম। সেখানে টেলিফোন আছে। কল এলে নার্স বা আয়া—যেই থাক, খুশির ক্যাবিনে খবর দেওয়া হয়। বেশির

ভাগ সময় ফোন ধরে নিশি। আত্মীয়-স্বজনেরা মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নেয়। বন্ধুবান্ধবদেরও ফোন আসে। বেশির ভাগ কল আসে আশরাফ সাহেবের বাসা থেকে। গত তিন-চারদিন অবশ্য কোন কল আসছে না। নার্সদের রিটায়ারিং রুমের পাশে এয়ার কণ্ডিশন্ড্ ভিআইপি ক্যাবিনে বাচ্চা প্রসবের জন্য এসেছেন এক মন্ত্রীর স্ত্রী স্পেশ্‌ল্ সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে; কারণ মন্ত্রী সাহেব প্রায়ই আসছেন সেখানে। ওই টেলিফোন সেট স্থানান্তর করা হয়েছে মন্ত্রীবধূর ক্যাবিনে।

সেদিন সকালে ওঁয়াওঁয়া শব্দ শোনা গেল ক্যাবিন থেকে। দর্শনার্থী আর শুভার্থীর ভিড়ে ক্যাবিন— এমনকি ক্লিনিকের প্রাঙ্গণও উপচে পড়ে আর কি। মিষ্টি আর উপহারের ছড়াছড়ি চলল দু'দিন ধরে। তৃতীয় দিনে খালি হয়ে গেল ভিআইপি ক্যাবিন। আবার টেলিফোন বাজল এবং নিশি জানালার কাছ থেকে মুখ সরিয়ে দেখল, আয়া ডাকতে এসেছে তাকে।

'আন্নিসা শবনম কার নাম, আপা?'

'আমার।'

'তাইলে আমনের ফোন।'

নিশি নার্সদের রিটায়ারিং রুমে গিয়ে রিসিভার তুলল। তার বুকে মাদলের শব্দ হচ্ছে। প্রচণ্ড আলোড়ন চলছে রক্তে। নিশ্চয় বশিরের কল। অবশ্য একবার এমনও মনে হয়েছে, জাফর ডাকতে পারে তাকে। সেদিন বাসায় ফোন করেছিল জাফর। নিশি মাথা ধরেছে— এই অজুহাতে কলটা রিসিভ করেনি। নতুন কাজের মেয়ে এসেছে বাসায়। সিদ্দিকা। সেই ফোন ধরেছে।

কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে নিশি বুঝল, তার সব অনুমানই

বৃথা। বশির বা জাফর, কেউ নয়, ক্লিনিকের কনসালটেশন বোর্ডের কামরা থেকে ডাকা হচ্ছে তাকে। রিসিভার রেখে আয়াদের দিকে তাকাল সে।

'কোথায় সেটা?'

আয়ার ডিরেকশন বুঝে নিয়ে নিশি প্রথমে ক্যাবিনে ফিরে আসে। খুশিকে জানিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু নিশি দেখল, মোটামুটি গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে আছে সে। এরকম ঘুমের সময় তাকে জাগানোর অনুমতি নেই। অনুমতি থাকলেও নিশি তাকে জাগাত না। কয়েকদিন ধরে একটুও ঘুম হচ্ছে না খুশির।

নিশি ধীরে ধীরে দরজা টেনে দিল বাইরে থেকে। তারপর উঠে পড়ল তেতলায়, কনসালটেশন বোর্ডের কামরায়।

ড. আলমগীরের হাতে খুশির ফাইল। দুরুদুরু বুকে সামনে গিয়ে বসল নিশি। কাল খুশির কয়েকটা টেস্ট হয়ে গেছে। আজ ড. আলমগীর জানাবেন, তার অবস্থা কেমন।

'বসুন। আপনার নাম আন্নিসা শবনম?'

'জ্বি।'

'আপনার বোনের একটা ভাল খবর আছে।'

জিজ্ঞেস করার সাহস হচ্ছে না নিশির। গত দু'তিনটে মাস ধরে একটানা খারাপ খবরের সঙ্গে লড়াই করছে তার স্নায়ু। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। নিশি চুপ করে তাকিয়ে থাকল।

ড. আলমগীর সরু চশমার ঘাড় ডিঙিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন নিশির দিকে। 'উনি...ভাল হয়ে যাবেন।'

নিশির শরীর হঠাৎ উল্লাসে এঁকেবেঁকে উঠে। 'জ্বি...সত্যি বলছেন?

'তবে···ওনাকে একটু কষ্ট করতে হবে।'

'কীরকম কষ্ট?'

'একটু ফিজিওথেরাপি দরকার হবে। আপনি বোন, আপনাকেই বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই যে ইলাস্ট্রেশনটা লক্ষ করুন। পোস্চার এক থেকে পোস্চার নয়।'

'জ্বি, দেখেছি। আমার শেখা আছে এগুলো।'

ড. আলমগীরের দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হয়, চশমা আরও একটু নেমে যায় নাকের ওপর। 'আপনি···গার্লস গাইড ছিলেন নাকি?'

'ঠিক গার্লস গাইড না হলেও···আপনার অনুমান আসল ঘটনার কাছাকাছি পৌঁছেছে। আমি স্কুলের সিভিল ডিফেন্স গ্রুপের চীফ ছিলাম। পিটি কমিটিও আমার নেতৃত্বে দেয়া হয়েছিল।'

'আই সি। দেন উই হ্যাভ ফাউণ্ড আউট আ রাইট পার্সন! ভালই হলো। এই ব্যায়াম চালিয়ে যেতে হবে তাকে। তবে···সাবধান। তাড়াতাড়ি ভাল হবার নেশায় উনি যেন আবার অতিরিক্ত এক্সারসাইজ না করেন।'

নিশি চিন্তিত স্বরে বলল, 'ঠিক আছে। দেখা যাবে।'

'আপাতত আপনারা ওনাকে বাসায় নিয়ে যেতে পারেন। প্রেসক্রিপশনে বাকি সব অ্যাডভাইস লিখে দিচ্ছি। মুরুব্বিদের দোয়া আছে ওনার ওপর। কঠিন এক বিপদ কাটিয়ে উঠেছেন। এই রকম রিকভারি সত্যি রেয়ার দেখা যায়।'

নিশি বাকি সব পরামর্শ বুঝে নিল। মানু টাকা রেখে গিয়েছিল আগেই। অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে গিয়ে দেনাপাওনা চুকিয়ে নিচে নেমে এল ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই। এবার একটা ফোন করা দরকার দুলাভাইকে। নিশ্চয় চমৎকার সারপ্রাইজ হবে।

কিন্তু ডায়েল ঘুরিয়েও ফোন ক্রেডলে রেখে দিল নিশি। কথাটা আগেই জানাজানি করে লাভ কী? বিশেষ করে খুশিকে জানতে দেবার দরকার নেই। ম্যাসাজটা যে দরকার হবে— সেটা আগেও ডাক্তার তাকে জানিয়েছিলেন। এতে নতুনত্ব কিছু নেই। আর অন্য কাউকে জানালে পরিণাম হবে একই। খুশির কানে পৌঁছে যেতে দেরি হবে না। তার চেয়ে থাক না। সময়ে সবাই সবকিছু জানতে পাবে।

উদার হাতে আয়া-নার্সদের বকশিশ দিল নিশি। রেন্ট-আ-কার কোম্পানির অফিসে টেলিফোন করে গাড়ি আনাল। এই অবসরে গোছানোর কাজটা শেষ করে নিল নিশি। গাড়ি ক্লিনিকের কম্পাউণ্ডে পৌঁছনোর পর খুশিকে ডাক দিল।

'আপা, বাসায় যাবে?'

চমকে চোখ মেলে তাকাল খুশি। 'বাসায়! কী বলছিস, নিশি?'

'সত্যি বলছি। তোমাকে রিলিজ করে দিয়েছে ডাক্তার।'

'ওরা···ওরা কেউ আসবে না?'

নিশির চোখে আনন্দের ঝিলিক। 'কী দরকার, আপা? দুলাভাই বিষম ব্যস্ত। খবর দিলেও এখন আসতে পারবেন না। তা ছাড়া কালই আমার হাতে টাকাকড়ি দিয়ে রেখেছিলেন। আমি এখানকার সব ঝামেলা মিটিয়ে মানি রিসিট, সার্টিফিকেট, প্রেসক্রিপশন, সব বুঝে নিয়েছি।'

'কিসে যাব, নিশি? গাড়িটা তো···'

বাধা দিয়ে নিশি বলল, 'গাড়ির ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। তুমি কি গরিব মানুষ? টাকা থাকলে এই শহরে কিছু আটকে থাকে না।'

নিশির কাঁধে ভর দিয়ে বেরুল খুশি। চমৎকার লাগছে বাইরের

পৃথিবী। একটুও আগের মত নয়। মাঝে মাঝে এই একঘেয়ে জীবন থেকে স্বেচ্ছায় লুকিয়ে থাকা ভাল, খুশির মনে হলো। দেখতে দেখতে বাসায় পৌঁছে গেল দুই বোন।

নিজের কামরায়, নিজের বিছানায় শরীর এলিয়ে শুতে পারার মত স্বস্তি আর আনন্দ খুব কম জিনিসেই পাওয়া যায়। খুশি নিশির হাত মুঠোয় চেপে ধরে।

'তুই ভারি স্মার্ট হয়েছিস, নিশি। তোর জন্যে আমার গর্ব হচ্ছে। ভয়ও হচ্ছে। একটা ভাল বর যদি তোর জন্যে জোগাড় করতে না পারি, নিজেকে অপরাধী লাগবে, জানিস?'

হাসল নিশি। 'পরের কথা পরে ভাবা যাবে। এখন মন দিয়ে আমার কথা শোনো। ডাক্তার কিছু সাজেশন দিয়েছেন। ঠিকমত পালন না করলে পা নিয়ে কিন্তু তোমার অনেক দুর্ভোগ আছে, বলে দিচ্ছি।'

খুশিকে একটুও চিন্তিত মনে হলো না।

'কী হলো? আমার কথা বিশ্বাস হলো না?'

খুশি বলল, 'ওসব আমি জানি।'

নিশি বিস্মিত হয়ে বলল, 'কীভাবে জানলে?'

'শুয়ে শুয়ে কত যে বই পড়েছি! বইয়ের চেয়ে বড় বড় ডাক্তার আর কে, বল?'

'তুমি কি জানো, তোমার পায়ের অবস্থা কী?'

খুশি খানিকটা দ্বিধার সঙ্গে বলল, 'ফিজিওথেরাপির পরামর্শ দিয়েছে ডাক্তার, তাই না? ওটা করলে কিছুদিনের মধ্যে ভাল হয়ে যাব, কী বলিস?'

নিশি খুশিকে জড়িয়ে ধরে। 'তুমি একটা ড্যাম··· ইয়ে···

আপা। তোমার স্মার্টনেসের কাছে আমার জ্ঞান-বুদ্ধি···পাত্তাই পায় না।'

খুশি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, 'একটা কথা।'

'বলো, আপা।'

'আপাতত কথাটা কাউকে বলার দরকার নেই।'

নিশি অনেকক্ষণ বোনের দিকে তাকিয়ে থাকল। 'দুলাভাইকেও না?'

'না।'

'বেশ তো।'

ক্রাচে ভর দিয়ে রান্নাঘরে গিয়েছে খুশি। কয়েকদিনের ব্যায়ামে যে উন্নতি হয়েছে, তার লক্ষণ আরও স্পষ্ট। আড়ালে মুখ টিপে হেসে সরে গিয়েছে নিশি। খুশিকে বিব্রত করে তার লাভ কী? এই সময় টেলিফোন বাজল।

অভ্যেসবশত রিং উপেক্ষা করে বাথরুমের দিকে যাচ্ছিল নিশি। এই সময় হঠাৎ তার মনে পড়ে, রান্নাঘর থেকে ছুটে আসার ক্ষমতা নেই খুশির। সে নিজেই ছুটতে ছুটতে ঢুকল বড় বেডরুমে।

'হ্যালো—'

'কে? রূপসী শ্যালিকা? তোমার ভগ্নি কোথায়?'

নিশি থতমত খেয়ে বলল, 'রান্নাঘরে গেছে, দুলাভাই।'

মানুর স্বরে আর্তনাদ। 'রান্নাঘরে! ডোন্ট টেল মি! এবার কি ও সত্যি সত্যি মরতে চায়?'

'আহ, দুলাভাই! এসব অলক্ষুণে কথা বলতে নেই।'

'কীভাবে রান্নাঘরে গেল?'

নিশি ঢোক গিলে বলল, 'আমি নিয়ে গিয়েছি। ওকে খুব দরকার?'

'হ্যাঁ।'

মোবাইল রিসিভারটা তুলে রান্নাঘরের দিকে ছুটল নিশি। 'আপা, তোমার টেলিফোন। দুলাভাই। তুমি রান্নাঘরে এসেছ শুনে সে কি রাগ! আমি বলেছি, আমার কাঁধে ভর দিয়ে এসেছ। তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন দুলাভাই…'

খুশি জানে, এরপর তার কী করার আছে। খুন্তি রেখে রিসিভার তুলে নেয় খুশি। 'আমার বোনটার ওপর চড়াও হয়েছ কেন, শুনি?'

ঘাবড়ে যায় মানু। অন্তত তার স্বর শুনে তাই মনে হয়। 'তোমার বোনের ওপর চড়াও হয়েছি! বলছ? আহা! শুনেও ভাল লাগছে।'

'খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।'

'বা রে! আমি আবার কী করলাম?'

'ও বেচারি আমাকে রান্নাঘরে নিয়ে এসেছে বলে ওকে বকুনি দিয়েছ না?'

মানু ভালমানুষের স্বরে বলল, 'তাই বলল বুঝি? আচ্ছা পাজী মেয়ে তো তোমার বোনটা! বশিরকে ছ্যাঁকা দিয়ে বিদায় করে ভেবেছে, সবাইকে অমন করে ল্যাং মারা যায়। তা…ভাল কথা, তুমি হঠাৎ বিদ্রোহ করে বসলে কেন?'

খুশি গলার স্বর নামিয়ে বলল, 'ভয়ে।'

'বুঝলাম না।'

'স্বামীকে বেশিদিন অন্যের হাতের রান্না খাওয়াতে নেই। স্বামীর মন ঘুরে যায়।'

হো হো করে হাসল মানু। 'এই হতভাগা মন ঘুরে আর কোথায়

যাবে, খুশিয়া বেগম? কপালে তো শেষ পর্যন্ত সেই একই খোঁয়াড়।'

'তবু···বোঝো তো···নারীর মন! আজ মন চাইল, তোমার জন্যে রান্না করি, বেশি না···পাঁচটা পদ···কি ছ'টা।'

'পাঁচ-ছ'টা! মাই গড! দাওয়াত করছ তো?'

'হ্যাঁ, আজ তুমি আমার বিশেষ অতিথি।'

মানু বলল, 'সঙ্গে একজন বেশি থাকলে অসুবিধে হবে?'

'মহিলা?'

'আরে দূর! পাগল নাকি? সে-সাহস থাকলে কবেই একটা নাটক করে ফেলতাম! ইয়ে···জাফর হাসান···তোমার ঘাবড়ানোর মত কেউ নয়।'

'বেশ, ওরও দাওয়াত। সঙ্গে নিয়ে এসো।'

সেদিন দুপুরে খাওয়ার টেবিল আবার সরগরম হয়ে উঠল। নিশি লক্ষ করল, অনেক দিন পর সে বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করছে। হাসছে। অনর্গল কথা বলছে। এটা তার অভ্যেসের বিপরীত।

খুশি তার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। তার প্রাণচঞ্চলা বোনটা দিনদিন কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে, ফুরিয়ে যাচ্ছে।

মানু বউয়ের রান্না করা প্রতিটি পদ বিশেষ যত্নের সঙ্গে মুখে তোলে। প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। জাফরের টিপ্পনিও তাকে কিছু নিরুৎসাহ করতে পারে না। নিশি আনন্দে হইচই করতে করতে ওদের সঙ্গে তাল দিচ্ছে। এমন সময় জাফরের একটা কথা তার সব আনন্দের আগুনে পানি ঢেলে দেয়।

'বেগুনের এই প্রিপারেশনটা বশির মিয়ার খুব প্রিয় ছিল, বস্।'

অপ্রসন্ন মুখে মানু বলল, 'হ্যাঁ।'

'কাল দুপুরের ফ্লাইটে বশির মিয়া কেটে পড়ছে। জানেন?'

'না তো!'

মানু বশিরের ব্যাপারে উৎসাহ দেখাচ্ছে না। হয় তার কোন কৌতূহল নেই, না হয় সে সব জেনে না-জানার ভান করছে। কোনটা সত্যি, বুঝতে পারছে না খুশি। কিন্তু তার নারীসত্তা মহা কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

'বশির···কোথায় যাচ্ছে, জাফর ভাই?'

'আমেরিকা।'

খুশির স্বরে সন্দেহের ছোঁয়া স্পষ্ট হয়। 'আমেরিকা! আমি তো শুনেছিলাম, সে নাকি নিউজিল্যাণ্ডে যাচ্ছে।'

'হয়তো আগে সেইরকম ব্যবস্থা ছিল। পরে মত বদলেছে। কিন্তু আমার কাছে পাকা খবর আছে। কাল দুটো বিশ মিনিটে তার ফ্লাইট।'

ডাইনিং টেবিলের রমরমা আনন্দসভায় ভাটা পড়ল। পাঙ্গাশ মাছের বিশেষ প্রিপারেশন আর নিশির মুখে রুচল না। বাকি সময়টা তার কাটল এক ধরনের আচ্ছন্নতার মধ্যে।

'রূপসী শ্যালিকা, তোমার বোন যতই দাওয়াত দিক, আমি কিন্তু তোমার কথা ভেবেই সব কাজ ফেলে ছুটে এসেছি। অথচ তুমি হঠাৎ এত ম্রিয়মাণ হয়ে গেলে···'

মানুর রসিকতায় আগ্রহ খুঁজে পায় না নিশি। তার শুধু ঝিকিমিকি জোনাকি-জ্বলা একটি রাতের কথা মনে পড়ে। একটি বিশ্বাসী হাতের মুঠোয় তার হাতের স্মৃতি তোলপাড় করে হৃদয়দেশ। কোথায় যেন কান্না গুমরে ওঠে। বিশ্বাসের মতই ভেঙে পড়ে জীবনের সব নদীর পাড়।

সেই লোক চিরদিনের মত দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

'কী হলো, ম্যাডাম আন্নিসা? হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলে যে! আমরা কি কোন অপরাধ করেছি?'

জাফরের কথায় নিশি মুখ তুলে তাকায়। কিন্তু তার উত্তর দিতে ইচ্ছে করে না। কেন যেন বিষম বিরক্তি বোধ করে সে। তার কেবলই একখানি কোমল মুখ মনে পড়ে। ওই মানুষ এমন এক বিশ্বাস ভাঙার মত কাজ করতে পারে— ভাবা যায় না। ঠিক কতটা দোষ ওই লোকের? আর কতটা দায়ী মোরশেদা?

নিশি সিদ্ধান্ত নেয়, বিমান বন্দরে বশিরকে দেখতে যাবে সে। কাছে যাবে না। বশিরকে জানতে দেবে না কিছু। শুধু দূর থেকে একবার দেখবে। তারপর নীরবে বিদায় জানিয়ে ফিরে আসবে।

এয়ারপোর্টের প্যাসিঞ্জার্স লাউঞ্জে ঢোকা চাট্টিখানি কথা নয়। সকাল আটটার দিকে বেরিয়ে দুপুর বারোটা পর্যন্ত রীতিমত গলদঘর্ম হতে হয়েছে নিশিকে। শেষপর্যন্ত ভিতরে ঢোকার অনুমতি জুটল, কিন্তু লাঞ্চের সময় পাওয়া গেল না।

দূর হয়ে যাক লাঞ্চ। নিশি সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল; অনুমতিপত্র দেখিয়ে ঢুকল কাচঘেরা লাউঞ্জে। বশির কোথায়? নিশির চঞ্চল চোখ এক সরল, আয়ত চোখের তরুণকে খুঁজে বেড়ায়।

এখনও এসে পৌঁছয়নি সে। লম্বা বেঞ্চের এক কোণে বসে অধীর দৃষ্টি রাখে এন্ট্রান্সে। প্রত্যেক যাত্রীকে লক্ষ করে। দেশী এবং বিদেশী। আনন্দিত এবং বিষণ্ন। শঙ্কিত এবং সাহসী। কোন কোন যাত্রী লাউঞ্জে ঢোকার আগে সঙ্গীদের জড়িয়ে ধরে অশ্রুময় বিদায় নিচ্ছে। লাউঞ্জে ঢোকার অধিকার নেই সবার। হাসি আর কান্না,

আশা আর নৈরাশ্য বিচিত্র এক দৃশ্য তৈরি করেছে।

নিশি বুঝতে পারছে না, মোরশেদার প্রেমে যার হাবুডুবু খাওয়ার কথা সে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে কেন? সেদিন সে কোয়াড করপোরেশনের অফিসে গিয়েছিল। মোরশেদা সেই আগের মতই আছে। কোন পরিবর্তন চোখে পড়ল না। সে কি তবে বশিরকে প্রত্যাখ্যান করেছে? আর কত আগুন জ্বালাবে মেয়েটা, নিশি ভেবে পেল না।

দুটো পনেরোয় ফ্লাইট। সোয়া বারোটার মধ্যেই এয়ারপোর্টে বশিরের রিপোর্ট করার কথা। ঘড়ি দেখল নিশি। সোয়া একটা। দেড়টা। বিদেশগামী সব প্যাসিঞ্জারের টিকিট, লাগেজ চেকিং আর অন্য সব এম্বার্কেশন ফর্মালিটিগুলো মেটানো হয়ে গেল। একে একে চলে গেল সবাই। নিশি তবু বসে থাকে।

ডিসপ্লে বোর্ডে প্লেন টেক অফ্ করার সিগন্যাল না পাওয়া পর্যন্ত বসে থাকল নিশি। তারপর বেরিয়ে পড়ল। খিদে লেগেছে, বাসায় যাওয়া দরকার। কিন্তু তার আগে ওর মনে হলো, দিলখুশায় একটা ট্র্যাভ্ল্ এজেন্সি অফিসে খোঁজ নেওয়া দরকার। বশির যদি বিদেশে যায়, ওই বন্ধুর এজেন্সির মাধ্যমেই যাবে।

ট্র্যাভ্ল্ এজেন্সির অফিসে বশিরের বন্ধুটিকে পাওয়া গেল না। কিন্তু ম্যানেজার ভদ্রলোক বেশ যত্ন করে বসাল তাকে। কফির অর্ডার দিল। তার কাছ থেকে জানা গেল, আজ নয়, সামনের মাসের এই তারিখে বশিরের যাবার কথা।

রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছল নিশি। এক ধরনের স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে। ম্যানেজারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল সে। বেবিট্যাকসি ডেকে চেপে বসল। 'বনানী।'

বারো

মানু আজকাল অবসর পেলেই বাড়িতে কাটায়। ক্লাবে যাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিত একসময়। আজকাল তাও বন্ধ। খুশি সবিস্ময়ে মানুর এই পরিবর্তন লক্ষ করে, উপভোগ করে।

সেদিন শুক্রবার। জাফর চলে গেছে খুলনায়। মানু বসেছে খুশির সঙ্গে আলোচনায়। সোমবার খুশির জন্মদিন। এ-বছর তাকে তাক লাগিয়ে দেবার মত পার্টি থ্রো করতে চায় মানু। অতিথিদের তালিকা চূড়ান্ত করার জন্য চাপ দিচ্ছে খুশির ওপর।

'সে কি! মাত্র ত্রিশজন?'

খুশি লাজুক হেসে বলল, 'আমার জন্মদিনের পার্টিতে না হয় শুধু বন্ধুবান্ধবদেরই ডাকতে পারি। বিজনিস কমিউনিটির লোকজন তো আর ডাকা যায় না!'

মানু বলল, 'ওসব হবে না। আমার নিজের বন্ধুবান্ধব— তা ধরো— চল্লিশ কি পঞ্চাশজনের মত হবে। আর তোমার...'

'আমার বান্ধবীরা কেউ এখানে নেই। বেশির ভাগ বান্ধবীর বিয়ে হয়েছে গোপালগঞ্জ কিংবা ফরিদপুরে। তাদের ঠিকানাও

বিশেষ জানি না।'

'এখানে যারা আছে, তাদের সবাইকে ডাকো। আশরাফ ভাইকে দাওয়াত করো। তা ছাড়া যত কাজিন আছে...'

কোঁক্ কোঁক্ শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। মানু অতিথি তালিকা খুশির হাতে ধরিয়ে দিয়ে টেলিফোন টুলের কাছে চলে গেল।

'হ্যালো—'

প্রথম শব্দটা জোরে উচ্চারণ করেছে মানু। এরপরেই তার গলার স্বর নিচু হয়ে আসে। কথায় এসে ভর করে বাড়তি গাম্ভীর্য আর আবেশ। ছুটির দিনে কার সঙ্গে রোম্যান্স জমাচ্ছে মানু? খুশি ভেবে পায় না।

রিসিভার ক্রেডলে রেখে ফিরে আসার পর মানু একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেল। তার মুখে হালকা লালিমা। চোখে উদাস উদাস ভাব। চোখের এইসব ভাষা পড়তে মেয়েদের দেরি হয় না।

খুশি কৌতূহলী স্বরে বলল, 'কে ফোন করল?'

মানু কি এক সেকেণ্ড দ্বিধায় ভুগল? 'ওই...আমার এক বন্ধু। নাজিম।'

'তোমাকে অস্থির দেখাচ্ছে কেন?'

মানু বিরক্ত হয়। 'অস্থির কোথায়? এখনই একবার বেরুতে হবে। প্যাকিজিং ইণ্ডাস্ট্রি করার জন্যে জায়গা খুঁজছিল, পেয়ে গেছে। এখন আমার মতামত চায়।'

'তা...তোমার কী করার আছে?'

মানুর বিরক্তি রীতিমত উষ্মায় পরিণত হয়। 'এত জেরা করছ কেন?'

খুশির স্বর অস্বাভাবিক শান্ত। শুধু তার চোখের মণিদুটো টলমল করে নাচে। 'জেরা করছি না। ব্যাপারটা বেখাপ্পা লাগছে, তাই জানতে চাইছি।'

মানু অতি দ্রুত কাপড় বদলে নিয়ে বলল, 'যাব আর আসব। দেরি হবে না।'

খুশি উদাস গলায় বলল, 'কোথায় যাচ্ছ, বললে না?'

'ওই তো···বাড্ডার দিকটায়। কী করব, বলো? এত করে ধরেছে সাহায্য করার জন্যে। "না" বলি কী করে?'

বেরিয়ে পড়ল মানু।

খুশির দিনটা মাটি হয়ে যায়। বিছানায় মুখ গুঁজে সে চুপচাপ শুয়ে থাকে। এই সময় নড়ে ওঠে দরজার পরদা। নিশি এসে কাছে বসে।

'আপা—'

'বল।'

'দুলাভাই আজ অফিসে গেলেন কেন, বলো তো?'

খুশি আধশোয়া হয়ে উঠে বসে। 'অফিসে যাবে কেন? ও তো বাড্ডায় গেল।'

নিশি মৃদু ধমকের সুরে বলল, 'তুমিও যেমন! তোমার বর যা বলে তাই বিশ্বাস করো। দুলাভাই অফিসে গেছেন। ফোনটাও এসেছিল অফিস থেকেই।'

'তুই কী করে জানলি?'

নিশি প্রথমটায় এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইল না। পরে খুশির জেরার মুখে বলল, 'আমি স্টোর রুমে ছিলাম। দুলাভাইয়ের সব কথা শুনেছি।'

'কে ফোন করেছিল, বুঝতে পেরেছিস?'

'অনুমান করতে পারি মাত্র।'

খুশি উদ্‌ভ্রান্তের মত বোনের দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রশ্ন করার সাহসও যেন হারিয়ে ফেলেছে।

নিশি ফেঁসফেঁসে গলায় বলল, 'ওই ডাইনীটা, আবার কে?'

'মোরশেদা?'

নিশি এবার আর উত্তর দেবার প্রয়োজন মনে করল না।

খুশি বলল, 'টেলিফোন কর তো মোরশেদার বাসায়। এখনই প্রমাণ হয়ে যাবে। অনুমানের ওপর নির্ভর করে আর বসে থাকতে হবে না।'

'আমি ওর সঙ্গে কথা বলি না, আপা।'

'বেশ, টেলিফোনটা আমার কাছে এনে দে।'

নিশি টেলিফোন এনে বিছানায় রেখে চলে গেল। বিষম বিরক্তি তার চোখেমুখে। খুশি প্রথমে মোরশেদাকে চাইল। কিন্তু মোরশেদার বাবা বললেন, সে সকালেই বেরিয়ে গেছে।

'কোথায় গেছে, জানেন?'

'বলল, প্রথমে অফিসে যাবে। সেখান থেকে বসের সঙ্গে যাবে কোন জমি দেখতে। আমিনুল ইসলাম সাহেব নাকি কোথায় জমি কিনবেন। সেই জমি দেখতে যাবার কথা।'

'কখন ফিরবে, বলে গিয়েছে?'

'বলেছে, ফিরতে দুপুর গড়িয়ে যাবে। আপনি কে বলছেন?'

খুশি তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি···ওর বান্ধবী। আপনি চিনবেন না।'

ফোন রেখে নিশিকে ডাকল খুশি। 'আমাদের পুরানো

ডায়েরীটা খুঁজে দিবি?'

পুরানো ডায়েরী পাওয়া গেল, কিন্তু তাতে নাজিমের টেলিফোন নাম্বার পাওয়া গেল না। অন্য এক বন্ধুর নাম্বারে রিং করে নাজিমের ফোন নাম্বার জোগাড় করতে খুশির প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার জোগাড়। আজকাল তার টেনশন সহ্য হয় না।

নাজিম খুশির কথা শুনে বিষম অবাক। 'আমি! কই, আমি তো টেলিফোন করিনি! তবে···হ্যাঁ, ভাবী, আপনাকে বোধহয় একটু সাহায্য করতে পারব। সেদিন আরিফুর রহমান বলছিল, ওরা শাহজাদপুরে একটা বাগানবাড়ি কেনার চেষ্টায় আছে।'

'শাহজাদপুরে! বাগানবাড়ি!'

'হ্যাঁ, ভাবী। বিখ্যাত এক বাগানবাড়ি। আরিফুর রহমান আর আমিনুল ইসলাম— দু'জনেই নাকি খুব ইন্টারেস্টেড।'

ফোন ছেড়ে দিয়ে স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকল খুশি। নিশি হাতের কাজ সেরে এসে জিজ্ঞেস করল, 'গোয়েন্দাগিরির কতদূর,আপা? কিছু কিনারা করতে পেরেছ?'

গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে খুশি। নিশির প্রশ্নের উত্তর দেবার কথা তার মনে থাকল না। আরিফুর রহমানের সঙ্গে তার একবার পরিচয় হয়েছিল, মানুর সঙ্গে বিয়ের পরপর। তখন আরিফ পাথরের ব্যবসা করে প্রচুর টাকা কামাই করেছে। আশেপাশের গরিব মানুষদের সে মানুষ বলে মনেই করে না। মানু তার ওই বন্ধুকে 'ডালভাত' খাওয়ার জন্য ডেকেছিল। আধঘণ্টার জন্য এসেছিল লোকটা। এর মধ্যে বোধহয় পঁচিশ মিনিট কাটিয়েছে খুশির শরীর সম্পদের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। খুশি নিশ্চিত জানে, লোকটার স্বভাব ভাল নয়। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য নিরিবিলিতে

পাওয়া মাত্র সে ইয়ার্কির ছলে খুশির পিঠে হাত দিয়ে চাপড় দিয়েছে। বলেছে, 'মানুর বউভাগ্য ঈর্ষা করার মত।' প্রায় ছিটকে সরে গিয়েছে খুশি।

সেই আরিফুর রহমানের সঙ্গে বাগানবাড়ি কিনতে গিয়েছে মানু। সঙ্গে মোরশেদা। এটা যে কোন বিজনিস ডিল নয়, খুশি ভালভাবেই জানে। বিজনিসের কোন ব্যাপার সে খুশির কাছে গোপন করে না; করার কারণও নেই।

তা হলে এই ব্যাপার!

বলবে না ভেবেও নিশিকে সব বলে ফেলল খুশি। নিশি প্রথমটায় উড়িয়ে দিতে চেয়েও ভেবে দেখল, ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখা দরকার। মানু সাহেব নিশ্চয় বউয়ের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে যা-খুশি করে বেড়াতে পারেন না! তাঁকে একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার।

শহরতলি এলাকায় বাগানবাড়ি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া একটা মেয়ের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। নিশি অবশ্য ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসার মত মেয়ে নয়। রাড্ডা এলাকার এক ভার্সিটি পড়ুয়া ছেলের সাহায্য নিয়ে বাগানবাড়ি খুঁজে বার করল সে। স্থানীয় দু'জন রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীকেও দলে বিড়ানোর দরকার হলো।

বাকি সমস্যার ভিতর তাদের কাউকে নাক গলানোর সুযোগ দিল না নিশি। তাতে কিছু কষ্ট বাড়ল, একটু ঝুঁকিও নিতে হলো। তবু অনেক অবাঞ্ছিত ঝামেলার হাত এড়ানো সম্ভব হলো। একটা সত্য আবিষ্কার করেছে নিশি: বিপদে না পড়লে জীবনের প্রায় কিছুই জানা যায় না। পুরোপুরি খবর নিয়ে খুশির কাছে ফিরে এল সে।

'প্রজেক্টের ব্যাপারটা পুরো গুল-তাপ্পি, আপা।'

'জানতাম।'

নিশি বেশ কিছুটা দ্বিধার পর বলল, 'আরিফুর রহমান মাঝে মাঝে বাড়িটা ব্যবহার করে তার বেআইনী কাজকর্মের জন্যে। অনেক ক্ষমতাধর মানুষও ওখানে যায়। বিনোদন আর কি।'

খুশি রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'অরপর?'

'দুলাভাই কালই প্রথম ওখানে গিয়েছেন। আগে কখনও যাননি।'

'সঙ্গে কে ছিল?'

নিশি বলল, 'ওরা যেমন বর্ণনা দিল, তাতে মোরশেদা ছিল বলেই মনে হয়।'

'আর কেউ ছিল না?'

'ওদের সঙ্গে আর কেউ যায়নি। তবে বাগানবাড়িতে আরিফুর রহমান, তার প্রেমিকা আর অন্য দু'জন সঙ্গী ছিল। কেয়ারটেকারও ছিল। দুলাভাইয়ের খুব পছন্দ হয়েছে বাড়িটা। সামনের সোমবার তিনি নিজের ব্যবহারের জন্যে ভাড়া করেছেন।'

'সোমবার?'

নিশি কিছুক্ষণ বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। 'আপা, সোমবার তো তোমার জন্মদিন! তাই না?'

খুশি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'মন খারাপ কোরো না, আপা। অন্তত ওইদিন তাকে বাগানবাড়িতে যেতে দেয়া যায় না। তুমি শক্ত হও। বাধা দেবে। পা ভেঙেছে বলে তোমার জীবনটা কিছু পঙ্গু হয়ে যেতে পারে না।'

'কেউ যদি আমার অথর্ব জীবনের সঙ্গী হবার চেয়ে অন্য কোথাও সুখ খুঁজে নিতে চায়, আমি বাধা দেব কীভাবে?'

নিশি বিরক্ত হয়ে বলল, 'স্ত্রীর অধিকারে।'

খুশির দু'চোখে ক্লান্তির ছায়া। 'মানুষের মনের ওপর জবরদস্তি চলে না, নিশি।'

'জানি। কিন্তু একটা অন্যায় প্রশ্রয় দেয়া কি ঠিক? সেটা তো আরেকটা অন্যায়। তুমি জেনেশুনে দুলাভাইয়ের অন্যায় মেনে নেবে?'

'কিন্তু আমার হাতে প্রমাণ কোথায়, নিশি?'

হাসল নিশি। 'দুলাভাইয়ের সঙ্গে আঠার মত লেগে থাকো। প্রমাণ পেয়ে যাবে। আগেই হাল ছেড়ে দিচ্ছ কেন?'

খুশিকে ব্যায়ামের আসনে বসিয়ে দিয়ে নিশি বাইরে যাবার জন্য তৈরি হলো। আজ তার চাকরির ইন্টারভিউ আছে। একটা বেসরকারি ব্যাঙ্কের জুনিয়র অফিসারের কাজ। মানু প্রথমে তাকে ওই চাকরি করতে দিতে রাজি ছিল না। তার নিজের এতগুলো ফার্ম। কত মানুষ কাজ করছে। নিশির কী দরকার বাইরে চাকরি নেবার? কিন্তু নিশি গোঁ ধরেছে, সে মানুর কোন ফার্মে কাজ করবে না। ভেবেছিল, মানু তো বটেই, খুশিও এতে অখুশি হবে। কিন্তু ঘটল বিপরীত ঘটনা। খুশি হাসিমুখে অভিনন্দন জানাল তাকে। মানুর বোঝা উচিত, বাড়ির সবাইকে সে নিজের মুখাপেক্ষী করে রাখতে পারে না।

সেদিন রাতে স্বামী-স্ত্রী মুখোমুখি হয়। খুশি শান্ত স্বরে বলে, 'জন্মদিনের প্রোগ্র্যাম করতে করতে চলে গেলে। তালিকাটাও তো বাকি থাকল।'

মানু খুশির কাঁধে আলতো চুমু খেয়ে বলল, 'তোমাকে বলা হয়নি, সোমবার এক বিশেষ ঝামেলা আছে আমার। ওই যে

আমিটার কথা বলেছিলাম…'

খুশি স্থির দৃষ্টিতে মানুর দিকে তাকাল। 'বেশ তো, পার্টি বাদ দাও না হয়।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছিলাম। এক কাজ করলে হয় না? দুপুরে…চলো…কোন ভাল রেস্টুরেন্টে খেয়ে নিই। সন্ধেবেলা আমি খুব ব্যস্ত থাকব। ফিরতে অনেক রাত হবে।'

'তোমার জমিজমার কাজটা দিনের বেলা সেরে নেয়া যায় না?'

মানু ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হয়ে পড়েছে। চোখের তারায় তার ইশারাও ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এটা তার নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠার লক্ষণ, খুশি জানে।

খুশি হাসতে হাসতে বলল, 'দুঃখ হচ্ছে তোমার?'

'দুঃখ! দুঃখ হবে কেন?'

'অনুশোচনা?'

মানু স্ত্রীর শান্ত, স্থির চোখে চোখ রেখে একটু ঘাবড়ে যায়। কিন্তু ঘাবড়ে গেলে চলবে কেন? সে ম্যানিজিং ম্যান। সবকিছু সামলে নিতে না পারলে কী দাম তার পৌরুষের? কী অর্থ তার অর্থ-বিত্তের?

'কী যে বলো! অনুশোচনার কী আছে?'

'না, ভাবছিলাম, আমার জন্মদিনের কথাটা ভুলে গিয়ে তুমি নিজের মনের মত প্রোগ্র্যাম ঠিক করেছ। এমন একটা দিনে আমি আমার ব্যর্থতা, অসহায়ত্ব নিয়ে একা ঘরে পড়ে থাকব, আর তুমি আনন্দের জোয়ারে ভেসে যাবে— ভেবে অনুশোচনা হতেই পারে। পারে না?'

মানু নিঃশব্দে একটা ঢোক গিলল। 'তুমি…তোমার উচিত ছিল

লেখক হওয়া, খুশিয়া বেগম। যেমন পারো ভাবতে, তেমনি বলতেও পারো।'

খুশি মানুর বুকে হাত বুলিয়ে বলল, 'শুধু তোমার মত ম্যানিজ করতে পারি না। বাদ দাও ওসব কথা। সোমবার আমি তোমাকে একা কোথাও যেতে দিচ্ছি না। হয় তুমি আমার সঙ্গে থাকবে, না হয় আমিই…'

বাধা দিয়ে মানু বলল, 'আচ্ছা, তা হলে…এক কাজ করা যাক। নাজিমের সেই প্লটে একটা সুন্দর বাড়ি আছে। দেখলে তোমারও ভাল লাগবে। আমরা ওইদিন বাড়িটাতে কাটিয়ে আসতে পারি। মাছ ধরা যাবে। বাড়িটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে...'

এবার বাধা দিল খুশি। 'বাগানবাড়ি, তাই না?'

'না,না। হ্যাঁ…তা…বাগানবাড়িও বলতে পারো। ঢাকার শহরতলিতে ওইরকম পুরানো বাড়ি আছে, ভাবাই যায় না। নাজিম্ তো প্রথমে বাড়িটা কিনতে চায়নি।'

'বাড়িটা নাজিমের? না তোমার সেই বন্ধু…'

মানু দৃশ্যত চমকে ওঠে। 'কার কথা বলছ?'

'তুমি আসলে রেগে যাচ্ছ। ভেবে দেখো, আমি তোমাকে রাগাতে চাইনি। আরিফুর রহমানের বাগানবাড়ি আছে শাহজাদপুরে। তোমার সেক্রেটারি যখন টেলিফোনে খবর দিল…'

'মাই গড! তুমি তাও জানো? কীভাবে জানলে, বলো তো?'

'তোমার ঠোঁটের নড়াচড়া থেকেও আমি অনেক কিছু বুঝে নিতে পারি। জানো না, হ্যাণ্ডিক্যাপ্ড্ মানুষের সিক্সথ্ সেন্স প্রবল হয়ে থাকে!'

মানু ধরা-পড়া মুখে হাসল। খুশির এই দুর্বল দিকটার কথা মানু

বিলক্ষণ জানে। উত্তরা ব্যাঙ্ক আর বিসিসিআইতে তার যে ক্যাপিট্‌ল্ আছে, তার চেয়ে এটা কম নয়। আর সে তা ব্যবহার করতেও জানে। খুশি অশ্রু গোপন করল।

মানু তাকে প্রবল বেগে জড়িয়ে ধরে চুমুতে চুমুতে অস্থির করে তুলল। 'মাই ডিয়ার খুশিয়া বেগম, ভাবছি, ম্যানিজিং ডিরেক্টরের পদটা তোমাকেই দেব।'

খুশি নিঃশ্বাসের শব্দে বলল, 'তোমার পদযুগলই আমাকে দাও, তাতেই আমি ধন্য। যাক গে, এবার বলো, ওই মুটকিটাকে বাগানবাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলে কেন?'

মানু দু'সেকেণ্ড সময় নিল উত্তর দেবার জন্য। 'আরিফ···ওকে দেখতে চেয়েছিল।'

'কেন?'

'লক্ষ্মী সোনা, আজ এ-ব্যাপারে আমাকে আর প্রশ্ন কোরো না। তোমার জেরার মুখোমুখি হবার চেয়ে পুলিশের হাতে পড়া ভাল। কিছুটা হলেও ম্যানিজ করতে পারতাম।'

'মানলাম। তা···আম্মাকে বাগানবাড়িতে নিয়ে যাবে বলছ?'

'ও, শিওর।'

'কাকে দেখাতে চাও?'

মানু বিছানার ওপর উঠে বসল। 'এবার আমি ভীষণ রাগ করব।'

কমিউনিটি ডিভ্যালাপমেন্ট ব্যাঙ্কে নিশির চাকরি হয়ে গেল। একই দিনে দুটো ইন্টারভিউয়ের মুখোমুখি হয়েছে নিশি। প্রথম কমিটি পাঁচজন প্রার্থী বাছাই করে ফাইনাল সিলেকশ্‌ন্ কমিটিতে পাঠায়। ফাইনাল সিলেকশ্‌ন্ কমিটি যে তিনজন প্রার্থীকে পছন্দ করেছে,

তার মধ্যে পড়েছে আন্নিসা শবনম।

সিটি ম্যানেজার নিয়োগপত্র দিয়েছেন তার হাতে। 'ওয়েলকাম, মিস শবনম। যদি অসুবিধে না থাকে, কাল কিংবা পরশুদিনই জয়েন করুন। আমাদের ম্যানিজমেন্ট সঙ্কট চলছে। বেস্ট অভ্ লাক।'

নিয়োগপত্র খুলে নিশি প্রথমে একটু দমে যায়। সে যেমন আশা করেছিল, তার তুলনায় বেতন অনেক কম। তবে একটাই আশা, নতুন ব্যাঙ্ক হিসেবে ভবিষ্যতে কিছু সুবিধে পাওয়া যাবে।

মানু উদার স্বরে অভিনন্দন জানাল নিশিকে। 'রূপসী শ্যালিকা, তুমি তা হলে প্রমাণ করলে, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।'

নিশি খোঁচাটা ফিরিয়ে দিল। 'না, দুলাভাই। কথাটা যে পুরোপুরি সত্যি নয়, তার প্রমাণ ইরাজ বশির। তার সুন্দর মুখ পরাজয় ঠেকাতে পারেনি।'

মানু ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল শব্দ করে। তার মানে বুঝতে নিশি বা খুশি— কারুর অসুবিধে হয় না। পৃথিবীতে অনেক অন্যায়, অবিচার হচ্ছে। আমি একা কী করতে পারি? আমি ন্যায়ের পথে থেকে মরব নাকি?

'তা···রূপসী শ্যালিকা···ওই ছোকরাও তো তোমাকে ঠকিয়েছে। হার হয়েছে তোমার। হয়নি? তুমি তো সুন্দর মুখ দেখে গলে গিয়েছিলে। কিন্তু কেমন প্রতারণা করল তোমার সঙ্গে! তুমি বেজায় ভালমানুষ। আমার সঙ্গে যদি অমন ফাউল খেলত, পা ভেঙে দিতাম। যাক গে, কবে খাওয়াচ্ছ?'

'আগে তো চাকরিতে যোগ দিই, বেতন পাই, তবে না খাওয়াব!'

মানু বলল, 'কবে যোগ দিচ্ছ?'

'ভাবছি, কালই।'

খুশি বলল, 'কাল বাদ দিয়ে পরশু যোগ দিলে হয় না? কাল সোমবার, আমরা আউটিং-এ যাচ্ছি। শাহজাদপুরে। তুই যাবি না?'

নিশিকে হঠাৎ গম্ভীর দেখায়। সে চাকরিতে যোগ দেবার তারিখ পেছানোর কথা ভাবছে, এমন সময় মানু বলল, 'না, না। পাগল নাকি? বোনের জন্মদিন সেলিব্রেট করার অনেক সময় পাবে ও। চাকরি পেয়েছে, আগে যোগ দিক।'

'একদিন পরে···কী এমন অসুবিধে, দুলাভাই?'

মানুকে বিষম বিরক্ত মনে হলো। 'ওখানে···তোমার ···ইয়ে··· না যাওয়াই ভাল। তা ছাড়া আমরা রাতটাও ওখানে কাটাব। পরদিন ফিরে আসতে দেরি হতে পারে। কী দরকার তোমার ওসব ঝামেলার মধ্যে গিয়ে? নতুন চাকরি।'

নিশি অসহায় দৃষ্টিতে খুশির দিকে তাকাল। খুশিকে উদাসীন মনে হয়। নিশিকে যেতে না দেবার পেছনে মানুর কোন উদ্দেশ্য নেই তো? থাক না। খুশি আর ভয় পায় না। তার কাছেও গোপন অস্ত্র আছে,মানু খবর রাখে না।

আরিফুর রহমানের বাগানবাড়ি ঠিক বসবাসের উপযুক্ত নয়। এমনিতে বেশ নিরালা এবং ঝোপজঙ্গলের ভিতরে এক ধরনের আদিম রোমাঞ্চ অনুভব করা যায়। রোম্যান্সের জন্যেও হয়তো ভাল। কিন্তু অসুবিধে অনেক।

মানুর কাঁধে ভর দিয়ে উঠনে ইজি চেয়ারে গিয়ে বসল খুশি। সে জন্মদিনের শুভেচ্ছা সফরে এখানে আসেনি। এসেছে আবিষ্কারের

নেশায়। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, তার চোখের আড়ালে মানু অন্য এক জীবনের রূপ-রস-গন্ধে বিভোর হয়ে আছে। অবশ্য এমনও হতে পারে, ব্যাপারটা এখনও ম্যাচিওর হয়নি। তবু খুশি তার আঁচ অনুমান করতে চায়। নিশিকে সঙ্গে আনতে রাজি হয়নি মানু। এতে দুটো সুবিধে হয়েছে। প্রথমত তাতে মানুর নিজস্ব জীবনছন্দে পতন ঘটত। তাকে বুঝতে,আবিষ্কার করতে অসুবিধে হত খুশির। আর দ্বিতীয়ত, সব কিছু নিশির জানাটাও ঠিক নয়। এমন কিছু ঘটতে পারে, জানাজানি হতে পারে, যা জানলে নিশি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হবে। এই বরং ভাল হয়েছে।

পঙ্গু স্ত্রীর সুখ-সুবিধের ব্যাপারে অবশ্য মানুর দৃষ্টি সবসময় সজাগ। বাড়ির অন্য সবাইকে সে তটস্থ রাখে। আরিফুর রহমানের বাগানবাড়ির কেয়ার টেকারকে বাড়তি বকশিশ আগাম দেওয়া হয়েছে সবসময় তার দিকে লক্ষ রাখার জন্য। খুশি জানে, ওর কাজের জন্য এটা বাড়তি অসুবিধে। মনে মনে প্রস্তুত হলো খুশি। যে-কোন অবস্থার মুখোমুখি হবার মানসিক প্রস্তুতি আছে তার। এমনকি কোন আবিষ্কার, কোন ঘটনা ছাড়াই পার হয়ে যেতে পারে আজকের দিন আর রাত।

কিন্তু সন্ধে মিলাতেই সে মানুর চোখের তারায় সেই চাঞ্চল্য দেখতে পায়। সে কারুর জন্য অপেক্ষা করছে। বাগানের শেষ প্রান্তে একটা পুরানো, অব্যবহৃত রান্নাঘর আছে। কিন্তু আজ ঘরটার দরজা খোলা। কেন? কাউকে জিজ্ঞেস করবে খুশি? না, থাক।

এই প্রশ্নের জন্য তাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। ভিসিআর-এ একটা আকর্ষক ছবির ক্যাসেট চালিয়ে দিয়ে

কিছুক্ষণের জন্য বিদায় চাইল মানু।

খুশি তার কাঁধ জড়িয়ে ধরে বলল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'দূরে কোথাও না, ডিয়ার খুশিয়া বেগম। বাগানের ওপাশে একটা ঘর আছে। ওখানে নিজাম আর আরিফ আসবে। আমরা একটু ড্রিঙ্ক করব আর তাস খেলব। তুমি ছবি দেখো। কোন দরকার হলে কেয়ার টেকারকে ডাক দিয়ো।'

'আচ্ছা।'

'রাগ করলে?'

খুশি হাসল। 'না। যাও তুমি।'

'আটটা-সাড়েআটটার মধ্যেই ফিরে আসব।'

অস্থির, অসংলগ্ন পা ফেলে বেরিয়ে গেল মানু। খুশি কয়েক মিনিট কাটাল অপেক্ষায়। তারপর কেয়ার টেকারকে ডেকে বলল, 'একটা উপকার করতে পারবেন?'

'জ্বি,বলেন।'

খুশি একশো টাকার নোট বাড়িয়ে ধরে বলল, 'একটা ওষুধ আনতে ভুলে গেছি। খুবই জরুরী। কষ্ট করে এনে দিতে পারবেন?'

মাথা চুলকায় কেয়ার টেকার। 'ওষুধের দোকান···সেই মধ্য বাড্ডায়।'

খুশি হাসল। 'দশটা ক্যাপসুলের দাম চল্লিশ টাকা। বাকিটা আপনার।'

খুশির চেয়েও বিস্তৃত হাসিতে মুখ ভরিয়ে টাকা নিল কেয়ার টেকার। 'ওষুধের নামটা লিখে দেন, ম্যাডাম।'

কেয়ার টেকার চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল খুশি। উরুসন্ধি থেকে শুরু করে পায়ের পাতা পর্যন্ত ম্যাসাজ করে নিল,

ঝাঁকুনি দিল ধীরে ধীরে। সব ঠিক আছে, হাঁটতে পারবে সে।

মানুর পথ অনুমান করে এগোতে শুরু করে খুশি। বুকের ভিতর বুনো মাদল বাজছে। শান্ত হতে হবে। মনকে বোঝায় খুশি। এটা সেরেফ একটা লুকোচুরি খেলা। জীবনের সবটাই আসলে এক খেলা। সেটা কখনও কখনও লুকোচুরি হতে পারে। ঘাবড়ানোর কী আছে?

দূরে, বিশ্ব রোডে গোঁ গোঁ শব্দে ট্রাক ছুটছে। খুশিও প্রায় ছুটতে ছুটতে এক সময় পৌঁছে যায় পরিত্যক্ত রান্নাঘরের কাছে। বাঁশের বেড়ার দরজাটা বন্ধ। ভিতরে না মদের গন্ধ, না তাস খেলোয়াড়দের হইচই। সেখানে মাত্র দু'জন মানুষের মিলিত চাপা শব্দ। কখনও মনে হয় দূর থেকে শোনা বন্য প্রাণীর চিৎকার, কখনও নিঃশ্বাসের প্রবল ডুয়েট গান।

দরজা খুলে ফেলল খুশি। সামান্য শব্দ। তাতেই থেমে গেল সব গর্জন, সব গান।

তেরো

এই আবিষ্কারকে বিজয় বললে ভুল হয় না। কিন্তু খুশির চোখে-মুখে বিজয়িনীর চিহ্ন দেখা গেল না। বরং তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে

কেবলমাত্র একটা পারিবারিক দায়িত্ব পালন করতে এসেছিল। এই দায়িত্ব পালন করার কথা নয় তার। কাজটা খুব বাজে। অন্যের একান্ত ব্যক্তিগত আর গোপনীয় জীবনে অনধিকার হস্তক্ষেপের মতই। কিন্তু দায়িত্ব কখনও কখনও ঝাড়ুর কাজ করে। আবর্জনা পরিষ্কার করতে গিয়ে অনেক দরকারী ভাল জিনিসও টেনে আনে, আবার বেছে-রাখা সুন্দর জিনিসগুলোর মধ্যে চলে যায় আবর্জনা।

মানুকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। তার ক্লান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে মনের অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করে খুশি। সে কি ব্যর্থতার গ্লানিতে ভুগছে? সে কি এরকম কোন ঘটনা কিংবা পরিণতির আঁচ অনুমান করেছিল? সে কি আহত সিংহের মত মনে মনে ফুঁসছে?

বোঝার উপায় নেই। একসময় খুশি এই বিশ্বাসের ওপর সব ঘটনার ভার ছেড়ে দিয়ে পরিণতির ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিল যে মানুর পতনের একটা সীমা আছে। তার পদস্খলন হওয়া খুব আশ্চর্যের নয়। কিন্তু পিছলে পড়ে যাবার আগে নিজেকে সামলে নেবে। কিন্তু এখন সবকিছু অন্যরকম লাগছে। বিশ্বাস জিনিসটাই অর্থহীন আর দুর্বোধ মনে হচ্ছে। কেন মানুষ বিশ্বাস করে? কেন বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণায় ছটফট করে?

খুশি নিজের শান্ত ব্যবহারে নিজেই খুব চমকে যায়। মোরশেদা দু'হাতে মুখ ঢেকে কাছেই বসে আছে। অসংবৃত কাপড় ঠিক করার কথাও যেন তার মনে নেই। তবে তার দেহ এখন শালীনভাবে আবৃত। একটা চাদর পেয়েছিল হাতের কাছে। তাই দিয়ে ভালভাবে শরীর ঢেকে রেখেছে। সেদিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাল খুশি। ওই ছন্দহীন, উদ্ধত শরীরটার জন্য পুরুষগুলো এমন বেহায়ার মত

লালায়িত হয়? পৃথিবীতে ভোগের কি আর কিছু নেই? আর কোন রূপ-রস-গন্ধ কি তাকে আকর্ষণ করে না?

নীরবতা একসময় তিনজনের কাছেই অসহনীয় হয়ে উঠল। মানু গলা পরিষ্কার করে বলল, 'আমি জানি, অপরাধ হাতে-নাতে ধরা পড়ে যাবার পর আত্মপক্ষ সমর্থনের বিশেষ কিছু থাকে না। থাকলেও সেটা তোমার কাছে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত মনে হবে। স্বীকার করছি, তোমার অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে বাইরের পৃথিবীটা একটু পরখ করে দেখছিলাম।'

খুশি বলল, 'তুমি এখানে কী করছিলে, তাতে আমার বিশেষ আগ্রহ নেই। কারণ ভালবাসা জিনিসটা অন্যরকম। কলেমা পড়ে বিয়ে করলেই আমরা একে অপরকে ভালবাসতে পারব— এমন কোন কথা নেই। ভাল না বেসেও দু'জন একসঙ্গে থাকতে পারি। সত্যি বলতে কি, এতগুলো দিন যখন গেছে, তখন...'

খুশির কাছে এগিয়ে এল মোরশেদা। 'আপা, আপনাদের ব্যক্তিগত আলাপের মধ্যে আমার থাকাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না।'

খুশির ঠোঁটে তীব্র তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাসি খেলা করে। 'ঠিক-বেঠিকের হিসেব হঠাৎ এত টনটনে হয়ে উঠল কেন? তুমি বসো। সমস্যাটা আমাদের নয়। মানে আমার আর এই ভদ্রলোকের নয়। তোমাদের দু'জনের। তোমরা দু'জনে মিলে আমাকে প্রতারিত করেছ। তোমরা দু'জনে আমার সাধের সংসারটা ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছ। বিশ্বাস করো, এত বড় এই পৃথিবীতে এই সংসারটুকু ছাড়া আমার আর কিছু ছিল না। কেউ ছিল না। তোমরা আমার একমাত্র সম্বল কেড়ে নিয়েছ।'

মানুর চোখে আতঙ্ক ভাব ফুটে ওঠে। সে জানে না, ঠিক কী

বললে খুশির বেদনার খানিকটা উপশম হবে।

মোরশেদা মেঝের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল। 'আপা···আমার··· কোন দোষ নেই। বিশ্বাস করেন, আমি চাইনি আপনার কোন ক্ষতি হোক।'

খুশি হেসে ফেলল। অস্বাভাবিক হাসি। 'আমিও চাই না, তোমার কোন ক্ষতি হোক। সত্যি করে বলো, তোমরা কি একে অপরকে চাও? আমি অনুমতি দিলে মানু আবার বিয়ে করতে পারে।'

মোরশেদার কপালে ঘাম ফুটে উঠল। 'আপা, আপনি···এসব কী বলছেন? আমার বিয়ে··· তো একরকম ঠিক হয়েই আছে।'

ঠোঁট দুমড়ে-মুচড়ে খুশি বলল, 'তাই নাকি? তা··· তোমার সেই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট কি ভার্জিন বউ পছন্দ করে না? তার কথা ভেবেই আমার সংসার ধ্বংস করতে এসেছ?'

মোরশেদার নাক ফুলে উঠল। 'আপা, বিশ্বাস করা না করা আপনার ব্যাপার। কিন্তু দুলাভাইকে জিজ্ঞেস করে দেখেন, জাফর সাহেবকেও বলতে পারেন। ওদের ইচ্ছেমত না চললে আমার সংসারটা ভেঙে যেত।'

'এখন আমি ভেঙে দিতে পারি না?'

মোরশেদা গলার স্বর নিচু করে, প্রায় সাপের মত হিসহিসিয়ে বলল, 'আপনি বুদ্ধিমতী। বোঝেন তো, আপনার চেয়ে ওঁদের ক্ষমতা বেশি— অন্তত আমার কোন ক্ষতি করার ব্যাপারে।'

খুশির মুখে ক্রোধ বা ক্ষোভের কোন ছায়া নেই। আধো হাসি, আধো বিদ্রূপ তখনও খেলা করছে অঙ্গভঙ্গিতে। মানুর দিকে তাকাল সে। 'সত্যি কথা বলো তো, এই মেয়েটাকে তুমি চাও?

বিয়ে করতে রাজি আছ?'

মোরশেদা কেঁদে ফেলল, 'আমাকে মাফ করে দেন, আপা। আমার জীবনটা তচনচ করে দেবেন না। আমি চলে যাচ্ছি। আমার অনেক শিক্ষা হয়েছে। আর কোনদিন আপনাদের কারুর সঙ্গে দেখা হবে না।'

মোরশেদা চলে গেল। খুশি জানে, তাকে ফেরানো যাবে না। মানুও জানে। সব মানুষই কোন না কোন সময় বিদ্রোহ করে। তখন তাকে আর বাধা দেওয়া যায় না।

ক্লান্ত, ভাঙা স্বরে মানু বলল, 'তুমি···ভাল হয়ে গেছ, হাঁটতে পারছ···অথচ···'

'তোমাকে জানাইনি। জানালে তোমার অপরাধ এই অন্ধকারের নিচেই চাপা পড়ে থাকত। এই অভিনয়টুকু না করে আমার উপায় ছিল না।'

মানুর চোখে আনন্দের ঝিলিক। সে খুশির চোখের দিকে না তাকিয়ে তার হাত ধরল। 'তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্যেই জীবনের অন্যায় সিঁড়িতে পা রাখতে হয়েছিল আমাকে। সে সব দিনের কথা নিশ্চয় তোমার মনে আছে!'

খুশি কেঁদে ফেলল। প্রথম, প্রবল, বাঁধ-ভাঙা কান্না। 'আছে। কিন্তু সে-সিড়িঁতে তুমি পা পিছলে পড়বে আর আত্মরক্ষা করতে পারবে না, ভাবিনি।'

'তা হলে···একটিবার সুযোগ দাও···আবার শক্ত পায়ে হাঁটি। জীবনে বেঁচে থাকার জন্যে সব সিঁড়ির কী দরকার আমাদের? আমি তো "মায়াকুটীর" নিয়েই সুখী থাকতে চেয়েছিলাম।'

খুশি মানুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

মানু ভরাট গলায় বলল, 'চলো, খুশিয়া বেগম। ঘরে ফিরে যাই।'

নিশি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। তার প্রথম দিনের চাকরির অভিজ্ঞতা খুবই চমৎকার। শুধু একটা বেদনা বিকেল থেকে কুরে কুরে খাচ্ছে তাকে। এই অভিজ্ঞতার আনন্দ আর গৌরবের ভাগ দেবার মত কেউ বাসায় নেই। কাল সকালে বশিরের ফ্লাইট। বিদেশে চলে যাচ্ছে সে, সত্যি সত্যি।

অনেক রাতে খুশি আর মানুকে পাশাপাশি হেঁটে ঘরে ঢুকতে দেখে সে একই সঙ্গে উল্লসিত আর উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। দু'জনেই কি দু'জনার কাছে ধরা পড়েছে? খুশি নিশির চোখের দিকে তাকিয়ে ব্যাকুলতা টের পায়। মানু বেডরুমে চলে গেলে সে এসে বসে নিশির কাছে। নিশিকে আর কতটুকু বলতে পারে সে গোপন অভিযানের কথা? যতটুকু পারল, বলল। নিশির মন থেকে একটা পাষাণ ভার নেমে যায়। অন্য গুরু বোঝা জমে ওঠে। যে লোক নিজের স্ত্রীর সঙ্গে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, সে শ্যালিকার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে না? এমনও তো হতে পারে, মোরশেদাকে ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করে বশিরকে বেকায়দায় ফেলা হয়েছে!

গভীর রাতে বিছানা ছেড়ে উঠল নিশি। টেলিফোন করল মোরশেদার বাসায়। মোরশেদা নিশির প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না, কেবলই কাঁদছে। বারবার ক্ষমা চাইছে নিশির কাছে। এরপর প্রশ্নের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করার মানে হয় না। নিশি অস্থির, উদ্বিগ্ন জাগরণে রাতটা কাটাল। এইরকম রাত কাটতে চায় না। প্রতিটি মিনিট, প্রতিটি সেকেণ্ড মানুষের সঙ্গে সকরুণ বিদ্রূপ করে;

তাকে নিয়ে তামাশায় মেতে ওঠে। তবু সেই রাত একসময় শেষ হয়। ভোরের আলো না ফুটতেই নিশি ছুটে যায় তার জীবনের প্রথম আলোর কাছে।

সকাল দশটায় ফ্লাইট। বশির শেষ মুহূর্তে করুণ চোখে তার থাকার ঘরটার দিকে তাকিয়ে আছে। অনেক স্মৃতি মিশে আছে এই ঘরের সঙ্গে। অনেক আনন্দ, অনেক বেদনা। সে জানে না, এই জীবন থেকে পালিয়ে যে-নতুন জীবনে পা বাড়াচ্ছে, কেমন হবে সেটা?

পাসপোর্ট-ভিসা আর প্লেনের টিকিটগুলো কাঁপা কাঁপা হাতে ব্রিফকেসে রাখতে যাবে, এমন সময় ঝড়ো হাওয়ার মত তার ঘরে ঢুকল নিশি। আঁকড়ে ধরল বশিরের হাত। পাসপোর্ট-ভিসা মেঝেয় পড়ে গেল। হাওয়ায় উড়ে গেল টিকিট।

'তুমি!'

নিশি ধরা গলায় বলল, 'মোরশেদা তার ষড়যন্ত্রের কথা আমার কাছে স্বীকার করেছে। জেনেছি, আমি তোমাকে মিথ্যে সন্দেহ করেছি। একটিবার আমাকে সুযোগ দাও। কথা দিচ্ছি, আমি আমার সব আবেগের মূল্য দেব।'

ওরা দু'জন অনেকক্ষণ দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকে। বশির ভারি গলায় বলল, 'কিন্তু আমি তো এক নতুন জীবনের পথে পা বাড়িয়েছি। ব্যবসা-পাতি গুটিয়ে ফেলেছি। অনেক টাকা খরচ করেছি ইমিগ্রেশন কনসালট্যান্ট আর টিকিট বাবদ।'

নিশি বলল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। কিচ্ছু ভেবো না। কালই আমি একটা চাকরিতে জয়েন করেছি। আমি তোমাকে সাহায্য করব। তুমি আবার ব্যবসা শুরু করবে।'

বশির নিশির হাতদুটো মুখের কাছে টেনে নিল। তার চোখে ভেজা হাসি। নিশির চোখের আলো সেখানে প্রতিফলিত হচ্ছে। মিটমিট করছে বশিরের চোখ, তাদের প্রথম ভালবাসার মুহূর্তে জোনাকিরা যেভাবে ঝিকমিক করছিল।

* * *

সেবা রোমান্টিক

জোনাকি ঝিকিমিকি

খন্দকার মজহারুল করিম

মানুষের জীবন রহস্যময়।
আরও বড় রহস্যময় তার মন, তার ভালবাসা।
আমাদের নিশি এক প্রহেলিকার রাতে ভালবাসার ডাক শোনে;
নিশির ডাকের মতই–
মায়াময়, ঘোর-লাগা, জটিল হাতছানি।

জীবনে ত্রিভুজ প্রেমের দেখা তো কতই মেলে!
কিন্তু নিশির জীবনে এই প্রেম হয়ে ওঠে প্লাবনের মত, তুফানের মত।
আর সমস্যা কি শুধু ওই দুই প্রেমিক?
কোন জাদুর বাক্স কোথায় কোন
ভেলকির প্যাঁচ কষছে, বুঝতে অনেক দেরী হলো ওর।

ভালবাসা অবশ্য অত সহজে হারিয়ে যায় না।
নিশ্চয়ই একদিন ফিরে আসে–
এক দুঃখরাতে – ঝিকিমিকি জোনাকির রহস্যে–
বুকের গোপন কুঠুরিতে ঘা দেয় সত্যিকার ভালবাসা।
নিশির গল্প, বশিরের গল্প
সেই প্রেম, সেই রহস্য আর সেই জাদুর।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো- রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো- রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০